# "দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে নারী"

জিনিয়া আবেদীন

Dhaka University Library
404177

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাজিয়া সুলতানা

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর-২০০৬

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, জিনিয়া আবেদীন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে নারী"** গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

404177

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাজিয়া সুলতানা

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ ঃ ৩০.০৮.০৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

*Dhaka University Institutional Repository*

# "দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে নারী"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম.ফিল.

ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর-২০০৬

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাজিয়া সুলতানা

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ (অবসরপ্রাপ্ত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

জিনিয়া আবেদীন

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন নং- ২৯, শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৯-২০০০

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| **প্রথম অধ্যায়** | ঃ | দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ | পৃষ্ঠা নং- ৫-২২ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | ঃ | অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীর অবস্থান | পৃষ্ঠা নং- ২৩-৩৬ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | ঃ | দোভাষী পুঁথিতে নারীর অবস্থান | পৃষ্ঠা নং- ৩৭-৬৯ |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | ঃ | দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে নারী সমাজ | পৃষ্ঠা নং- ৭০-৭৮ |
| **উপসংহার** | ঃ | | পৃষ্ঠা নং- ৭৯-৮১ |
| **গ্রন্থপঞ্জি** | ঃ | | পৃষ্ঠা নং- ৮২-৯১ |

Dhaka University Institutional Repository

## প্রথম অধ্যায়

# দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তার ছিল না, শিক্ষা লাভের প্রতিও অনীহা ছিল। বিজাতীয় ইংরেজদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহের অভাব ছিল। ফলে, ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে হিন্দুসমাজ এগিয়ে যাচ্ছে আর মুসলমান সমাজ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। একটা হতাশা ও বেদনার মধ্যে মুসলমানগণ সমাজে বাস করছিল। মুসলমানগণ তাঁদের নিজেদের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করার জন্য একটি নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই প্রয়োজনীয়তা থেকে দোভাষী পুঁথি-সাহিত্যের উদ্ভব হয়।

আঠারো শতকে শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার হাতে দোভাষী সাহিত্যের উন্মেষ হলেও এই সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল কলকাতার বটতলা–কেন্দ্রের কিছু ছাপাখানা অবলম্বন করে। হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ-পরগণার মুসলমানগণ এই দোভাষী পুঁথি রচনা করেন।

শোভাবাজারের মোড়ে এক শান বাঁধানো বটগাছকে কেন্দ্র করে দোভাষী পুঁথির প্রচার ও প্রসার ঘটে। শ্রীরামপুর প্রেসের ভূতপূর্ব কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর *ভট্টাচার্য* প্রথম বাঙ্গালী প্রকাশক ও মুদ্রাকর। তিনি প্রথম দেশীয় মালিকানায় 'বটতলা'র হাটে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ সালের দিকে বিশ্বনাথ দেব বটতলায় প্রেস স্থাপন করেন। বটতলার বইয়ের প্রকাশকেরা চিৎপুর রোডকে বটতলা বলে চিহ্নিত করে থাকেন। শুধু চিৎপুর রোড নয়, আশেপাশের অলিগলিও বটতলা নামে পরিচিত ছিল। উনিশ শতকের (১৮৬০) শেষদিকে চকবাজারের কেতাবপট্টিকে কেন্দ্র করেও ঢাকায় দোভাষী পুঁথির চর্চা গড়ে উঠে।[১]

---

১। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম *ঃ চকবাজারের কেতাব পট্টি*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০,জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা সিটি মিউজিয়াম), পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository


চকবাজারের আশেপাশের এলাকা মোগলটুলী, বড়কাটরা, ছোটকাটরা, চাম্পাতলি, ইমামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে দোভাষী পুঁথির চর্চা বিস্তার লাভ করেছিল। ১৮৬০ সালে ঢাকায় প্রথম বাংলা ছাপাখানা ('বাঙ্গালা যন্ত্র') প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুস্তক প্রকাশনা শুরু হয়। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাগুলো হচ্ছে 'সুলভযন্ত্র' (১৮৬৩), 'মুহম্মদী যন্ত্র' (১৮৭৩), 'আজিজিয়া প্রেস' (১৮৭৬) 'সাইদী যন্ত্র' (১৮৭৯), 'ইমদাদুল এসলামিয়া প্রেস' (১৮৯৫)।[২]

এভাবে ছাপাখানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দোভাষী পুঁথির প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। ফলে, দোভাষী পুঁথির লেখকগণ পুঁথি রচনায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হন। আহমদ শরীফ সম্পাদিত *'পুঁথি পরিচিতি'*র পরিশিষ্টে আঠারো ও উনিশ শতকের কয়েকশত দোভাষী পুঁথির তালিকা রয়েছে। বৃটিশ মিউজিয়াম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে প্রচুর দোভাষী পুঁথি রয়েছে। এছাড়াও বাংলা একাডেমীর 'শহীদুল্লাহ্-স্মৃতি-পাঠকক্ষে' ছয়শত এগারটি দোভাষী পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

এই বিশেষ ধরণের গ্রন্থের প্রসার ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার হাতে দোভাষী ভাষারীতির উদ্ভব ঘটে। দোভাষী পুঁথির ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত *"মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি"* গ্রন্থসূত্রে জানা যায়, পাদ্রী জেমস লঙ্ দোভাষী পুঁথি সাহিত্যকে দু'ভাবে চিহ্নিত করেছেন। লঙ্ সংকলিত ১৮৫৫ ও১৮৫৭ গ্রন্থ তালিকায় Musalman Bengali Literature এবং ১৮৬৭-র তালিকায় Musalman Bengali works নামে কিছু গ্রন্থ নথিভুক্ত আছে। লঙ্ ১৮৫৭ সালের বাংলা প্রকাশনা বিষয়ক প্রতিবেদনে বলেছেন,

"They (Musalmans) speak Bengali but with a considerable

---

২। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ *চকবাজারের কেতাব পট্টি*, পৃষ্ঠা-১৫।

Dhaka University Institutional Repository


intermixture of Persian or Urdu terms, the books called Musalman Bengali are prepared on this plan, the idiom and terms are Persian, the language Bengali, it is in fact a compromise between Persian and Bengali, as Urdu was the same between Persian and Hindi, but as Bengali is the language of the Courts and the Vernacular of the schools, this dialect will probably die away gradually ..... these books are read chiefly by boatmen who ..... are fond of song and by Musalman servants, shopkeepers. (ppxxx.....xxxl)"৩

জে-এফ ব্লুমহার্ট সম্পাদিত বৃটিশ মিউজিয়াম ক্যাটালগ ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির বাংলা ক্যাটালগে মুসলমানি বংলায় রচিত গ্রন্থের নাম আছে এবং তা Musalman Bengali বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন শুধু এধারার সাহিত্যকে নয়, মুসলমান রচিত মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন।[৪]

পুঁথি সাহিত্যের নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান,[৫] ডঃ কাজী আবদুল মান্নান,[৬] ডঃ আহমদ শরীফ[৭] 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্য' নামকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

---

৩। *মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি* (১৮৫৩-৬৭) মূল সংকলক অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২০মে,১৯৯৩,৪১ লেলিন সরণী, কলকাতা,পৃষ্ঠা-৯ আনা।

৪। সুকুমার সেন ঃ *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৩৫৮ ।

৫। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ ঃ ২৪।

৬। Dr. Qazi Abdul Mannan: *The Emergence and Development of Dobhasi* literature in Bengal up to 1855, Bangla Academy Dacca,1974, p-156.

৭। আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খন্ড)*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃঃ ৮৭৫।

Dhaka University Institutional Repository


ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ শ্রেণীর সাহিত্যকে 'মুসলমানী পুঁথি সাহিত্য' নামে চিহ্নিত করেছেন। মুসলমানী পুঁথি সাহিত্য নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলেছেন- 'এই শ্রেণীর কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানের ধর্মীয় বা জাতীয় ঐতিহ্য।'[৮] তিনি এ শ্রেণীর সাহিত্যের ভাব ও ভাষায় ইসলামী প্রভাব অবলোকন করেছেন। তবে এ ধারার সাহিত্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের *কালুগাজী চাম্পাবতীর কাহিনী, মহুয়া, কাজলরেখা, বোনবিবি জহুরানামা, ভেলুয়া সুন্দরী* প্রভৃতি পুঁথিও রয়েছে। আবার, হিন্দু ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সত্যপীরের কাহিনী, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতি বিষয় এসেছে এই সাহিত্যধারায়।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এ ধারার সাহিত্যকে 'দোভাষী বাংলা বা মুসলমানী বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, দোভাষী পুঁথির ভাষা নিম্ন-বঙ্গ এবং তৎসন্নিহিত 'ওহাবী আন্দোলনের' প্রভাবে প্রভাবিত অঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিত বা শিক্ষিত মুসলমানের মুখের ভাষা। তিনি আরও বলেন,"নিম্ন-বঙ্গের সাধারণ মুসলমানেরা তাঁহাদের বাংলা-ভাষাকে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রতিবাদস্বরূপ ফারসী, উর্দু ও হিন্দী ভারাক্রান্ত করিয়া এক স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করিতে থাকেন।"[৯] তাঁর মতে, এক শ্রেণীর লোক সিংহাসনচ্যুত হওয়ার যে বেদনা ও ক্ষোভ তা থেকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেছিল।

সৈয়দ আলী আহসান দোভাষী পুঁথি নামকরণের সমর্থনে বলেছেন- "দোভাষী পুঁথিতে বাংলার সাথে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হত বলে, আমরা এই নামকরণ করেছি।"[১০]

ডঃ আনিসুজ্জামান দোভাষী ভাষারীতিতে বাংলা-হিন্দি-ফারসি-আরবি-তুর্কি

---

৮। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ *বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খন্ড)*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ২৭০।

৯। মুহম্মদ এনামুল হক ঃ *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রথম মুদ্রণ-১৯৫৭, পৃঃ ২৭৫ ।

১০। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় সংকরণ, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository


শব্দের মিশ্রণ ঘটায় একে ' মিশ্র ভাষারীতি'[১১] নামে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এ ভাষারীতিতে দুটি ভাষার নয়, বহু ভাষার শব্দ মিলেছে। তবে বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার শুধু দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে নয়, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়।

ডঃ আহমদ শরীফের মতে, ভারতীয় ভাষায় কোন আরবী শব্দই সোজাসুজি আসে নি, এসেছে ফারসির মাধ্যমে। ফারসি ও তুর্কি এদেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে শাসকের প্রয়োগে ও প্রভাবে। ফারসি (কিছু তুর্কি) শব্দের আধিক্যে গড়ে উঠেছে আধুনিক উর্দু ভাষা। আর এর বিপুল প্রভাব রয়েছে হিন্দি ভাষায়। এ দুটোর আদি সাধারণ নাম ছিল হিন্দুস্তানি এবং মুসলিম আমল থেকেই দিল্লি সাম্রাজ্যে 'লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা' হিসাবে চালু ছিল এ ভাষা। এই হিন্দুস্তানি তথা উর্দুর সঙ্গে বাংলার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই দোভাষী রীতি। অতএব, দোভাষী রীতিই এর যোগ্য ও যথার্থ অভিধা।[১২]

ইংরেজরা ১৮৪৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৮৩০-১৮৩৫ সালের আগ পর্যন্ত ফারসিকে তারা রাজভাষা হিসাবে ব্যবহার করত। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফারসি ভাষা প্রচলিত থাকায় লিখিত ভাষায় ফারসি প্রভাব ছিল স্বাভাবিক। রামরাম রসুর *'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত'*(১৮০১) গ্রন্থ থেকে হিন্দু লেখকদের সাধু ভাষায় চর্চা শুরু হয়। মুসলমান লেখকদের মধ্যে গোড়া থেকেই সাধু ভাষার প্রতি অনীহা ও অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মুসলমানরা যে ভাষায় কথা বলত সেই ভাষার প্রভাব তাদের লিখিত ভাষার উপরও বর্তায়।

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের পাশাপাশি তখন সাধু বাংলায়ও মুসলমান লেখকগণ সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন। মীর মোশাররফ হোসেন তাঁর'বিবি *খোদেজার বিবাহ'*

১১। আনিসুজ্জামান ঃ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃঃ ৯৫।
১২। আহমদ শরীফ ঃ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (দ্বিতীয় খন্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ঃ ৮৭৫।

Dhaka University Institutional Repository


(১৯০৫) ভূমিকায় একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলমানদের মধ্যে তিন শ্রেণীর পাঠক ছিল–(১) মুসলমানী পুঁথির পাঠক ,(২) সাধু বাংলার পাঠক, ও (৩) উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের পাঠক।[১৩]

উনিশ শতকের দোভাষী পুঁথির পাশাপাশি মুসলমান লেখকের গদ্য রচনার কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস দেখা যায়। এ ধরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী রচিত *উচিত শ্রবণ*(১৮৬০), মুন্সী নামদারের *কাশিতে হয় ভূমিকম্প নারীদের একি দম্ভ*(১৮৬৩), *দুই সতীনের ঝকড়া* (১৮৬৭), শিমূয়েল পীর বকসের *বিধবা বিবাহ নাটক*(১৮৬০), গোলাম হোসেনের *হাড় জ্বালানী*(১৮৬৪), আয়েন আলী শিকদারের *কুড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে*(১৮৬৮) প্রভৃতি। উনিশ শতকের প্রধান লেখকের মধ্যে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক ও মীর মশাররফের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা গদ্য ও কাব্য রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) রচিত কাব্যগুলো হচ্ছে- *বিরহ বিলাপ* (১৮৭০), *কুসুম কানন* (১৮৭৩), *অশ্রুমালা* (১৮৯৬),*মহাশ্মশান* (১৯০৪)। মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) রচিত প্রথম গ্রন্থ কুসুমাঞ্জলি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এ ছাড়া তাঁর রচিত *মহর্ষি মনসুর*(১৮৯৪) ও *ফেরদৌসী চরিত* (১৮৯৮) উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফের নাম বিশেষ—ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে *রত্নবতী*(১৮৬৯), *গৌরীসেতু*(১৮৭৩), *বসন্ত কুমারী নাটক* (১৮৭৩), *জমিদার দর্পন*(১৮৭৩), *এর উপায় কি?*(১৮৭৫), *বিষাদ সিন্ধু*(১৮৮৫-১৮৯১), *উদাসীন পথিকের মনের কথা* (১৮৯০)। শেষ জীবনে তিনি দোভাষী পুঁথির বিষয় নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর ভাষা সাধু ভাষা হলেও বিষয় ছিল ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ক, যেগুলো 'দোভাষী পুঁথি' সাহিত্যেরও প্রধান অবলম্বন ছিল। গ্রন্থগুলো হচ্ছে

১৩। *মশাররফ রচনা-সম্ভার* (দ্বিতীয় খন্ড) সম্পাদনায় ডঃ কাজী আবদুল মান্নান,বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮০ পৃঃ ৫৭৩,৫৭৪।

Dhaka University Institutional Repository


*বিবি খোদেজার বিবাহ* (১৯০৫), *হযরত বেলালের জীবনী* (১৯০৫), *হযরত আমীর হামজার ধর্ম জীবনী লাভ* (১৯০৫), *মদীনার গৌরব*(১৯০৬), *মোসলেম বীরত্ব*(১৯০৭), *এসলামের জয়* (১৯০৮) প্রভৃতি । এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল – বটতলার পুঁথি পাঠে অভ্যস্ত বিপুল পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করা এবং বই বিক্রি করে লাভবান হওয়া।[১৪]

আঠারো শতকে শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা দোভাষী রীতিতে যখন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন, তখন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। পরবর্তীকালে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পর বিশেষ করে বটতলা ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় সুলভে পুস্তক প্রকাশের যে সুযোগ দেখা দেয়, সেই সুযোগের সদ্বব্যবহার করে অসংখ্য মুসলমান লেখক দোভাষী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন।

দোভাষী সাহিত্যের পরিধিও কম ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে এই সাহিত্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়ে সাহিত্য রচিত হয়-

১। **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ঃ** *মধুমালতী, ইফসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, মালুখাঁ ও রসনেছা কন্যার পুথি, গোলে বকাউলী ও তাজল মুল্লুকের কেচ্ছা, সয়ফুল মুল্লুক-বদিউজ্জামাল, সখি সোনার কেচ্ছা, হাতেম তাই* প্রভৃতি।

২। **ইসলাম ধর্ম বিষয়ক পুঁথি ঃ** *কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আউলিয়া, কেয়ামতনামা, হেদায়েতুল ইসলাম, হাজার মসলা, মৌলুদ শরীফ, নছিয়তনামা, বিসমিল্লাহর বয়ান, নামাজ মাহাত্ম্য* প্রভৃতি। এসব গ্রন্থে কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামী জীবন বিধান সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনও রয়েছে।

৩। **জঙ্গনামা বিষয়ক পুঁথি ঃ** *জঙ্গে খয়বর, জঙ্গনামা বা শহীদে কারবালা, আমীর*

---

১৪। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা* ঃ সকালের দর্পণে, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পৃ ঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository


*হামজা, জোলমাতনামা, সোনাভান* প্রভৃতি। এ সমস্ত পুঁথিতে হযরত আলী, হানিফা, আমীর হামজাকে নায়ক হিসেবে চিত্রিত করে অমুসলমান নারীকে নায়িকারূপে দেখানো হয়েছে। নায়ক যুদ্ধে জয়লাভ করে বহু অমুসলমানকে ইসলামী শিক্ষা দান করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন।

৪। **সূফীতত্ত্ব বিষয়ক পুঁথি** ঃ এই পুঁথিগুলিতে সূফীতত্ত্বের কথা বিবৃত হয়েছে। পীর ও দরবেশের জীবনী এসব পুঁথির বৈশিষ্ট্য। *মনসুর হাল্লাজ, তরিকতে হক্কানী, ভব-তারণ, হকিকতে মারিফত, দরবেশী গান, নিযামুদ্দীন আউলিয়া, শাহ মাদার* প্রভৃতি পুঁথি উল্লেখযোগ্য।

৫। **পীর পাঁচালী বিষয়ক পুঁথি** ঃ এসব গ্রন্থে দেশের পটভূমিতে হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অলৌকিক ক্ষমতা বলে মুসলমান পীর ফকিরদের জয়লাভের কথা রয়েছে। যেমন- *বোনবিবি জহুরানামা, কালুগাজী- চাম্পাবতী, সত্যপীরের পুঁথি।*

দোভাষী পুঁথির ভাষার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সাধু বাংলা থেকে দোভাষী পুঁথিকে পৃথক করেছে-

ক) আরবি ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ। যেমন -

তোমাদের মধ্যে ভাল ঈমানদার ওই।
আরবি

আওরতের হক্কে তিনি করেন ভালাই*
আরবি আরবি

মোবারক মুখে রাছুলুল্লা ফরমিয়াছে ॥
আরবি আরবি

যে জন নরমী করে জরু লাড়কা পরে *
আরবি

জেয়াদা ইমানদার জানিও উহারে ৷ (*মেছবাহুল ইসলাম*, পৃঃ ৯৭ )
ফারসি

খ) বিশেষণে এয়ছা, যেয়ছা, কেয়ছা, তেয়ছা, এত্তা, বেত্তা, থোড়া, আভি ইত্যাদি অব্যয় শব্দের বহুল প্রয়োগ। যথা-

Dhaka University Institutional Repository



(১) নিশিথে পালঙ্গ পরে , শুইয়া নিদ্রার ঘোরে,

স্বপনেতে দেখিল এয়ছাই॥

দেলারাম বিবি এসে, ছেরেনাতে কাহে বৈসে,

আপনার দুঃখ ও ভালাই* (*দেলারাম*, পৃঃ ৫)

(২) তুমি যেয়ছা বাদশাজাদা কর বাদশাজাদি ॥

আল্লা চাহে হোক তোমার মোবারক বাদি * (*দেলারাম*, পৃঃ ৮)

(৩) তামাম সেহেলী তার একই ওম্মর ॥

যেয়ছা বিবী তেয়ছা বান্দী একি বরাবর * (*জৈগুনের পুথি* পৃঃ ৯)

(৪) এইরূপে দুইজনে ছিল আদাওতি।

আল্লার মক্‌কর দেখ হয় কেয়ছা তাতি ॥

(মুহম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদিত শাহ গরীবুল্লাহ ও *জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৪১)

(৫) থোড়া দূর গিয়া বিবি নেকালিল ফন্দ ॥

চোরের তরেতে দেখ লাগাইয় ধন্দ * (*দেলারাম*, পৃঃ ৩৩,৩৪)

(৬) কারুন নামেতে বাদশা বড় নামদার।

মালের ছবরে কেয়ছা হইল ছারখার ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৪৬ )

(৭) জয়নাব কদবানু এয়ছা কান্দে দুইজনে।

এতদিনে রক্ত মোদের জ্বলিল আগুনে ॥( *জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৭১)

(৮) যদি সে তালাক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি ।

তবেত কবুল আমি করিব যে আভি ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৪২)

(৯) থোড়া বাদে ফের বিবি রাখিয়া পাস্কারে।

রসি আর এক বেত রাখিল হুজুরে ॥ (*নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ৫)

গ) সর্বনামে তেরা, মেরা, তুঝে, মুঝে ইত্যাদি উর্দু ও হিন্দি শব্দের ব্যবহার।

(১) পেও সরবতের জাম, নাম মেরা দেলারাম, ঘর মেরা ফলানা মুল্লুকে॥

হালওাইর বেটি আমি, নিশ্চয় জানিও তুমি,এই চিহ্ন কহিনু তোমাকে *

যদি দেল চাহে তেরা, খবর লইবে মেরা,যাই আমি হইয়া বিদায়॥ (*দেলারাম*, পৃঃ৬)

Dhaka University Institutional Repository


(২) সরবতের জাম এক দিল হাত পরে *

পেলাইয়া মুঝে সেই গেছে কোথাকরে ॥(*দেলারাম*, পৃঃ ৭)

(৩) শুন বিবি তুঝে কহি, দেলেতে বুঝিবে ছহি, নামমেরা পাহালওয়ান ওবাল।

গিধড় মারিয়া তেরা, দেমাগ বাড়িল বড়া, সেই জোরে কর তকব্বরি ॥(*জৈগুনের পুঁথি*,পৃঃ৭)

(৪) এমন বিবিকে মেরা রেখে নাহি কাম ॥

যথা ইচ্ছা তথা চলে যাও দেলারাম * (*দেলারাম*, পৃঃ ৩৭)

(৫) অধম গরীব কহে মুঝে দিকে ক্ষমা ।

নবী নাম কর ভাই নাই তার সীমা ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ৯৮)

ঘ) অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে আরবি, ফারসি ও হিন্দি শব্দ খাতিরে বা খাতেরে, হুজুরে, তরে, বিচে, ভি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ।

(১) কি খাতিরে পেরেশান, কর আপনার জান, কহ মোরে সেই সব হাল *

কি খাতিরে বেচ লাকড়ি, কার দায় কর চাকরি,কহ মুঝে সেই সব বাত ॥(*দেনারাম*,পৃঃ ১৮)

(২) কত গোণা করিয়াছি তোমার হুজুরে।

রহম নজর করে মাফ করে মোরে ॥ (*জঙ্গনামা*,পৃঃ ১৩৩)

(৩) ফাতেমা খাতুন তবে এমামের তরে ॥

রাখিয়া গেলেন বিবী আপনার ঘরে * (*নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ৪)

(৪) আসিয়া ময়দান বিচে উতরিল যদি*

খুশি হালে শিকার করিয়া ফিরে বিবী ॥ (*জৈগুনের পুঁথি*, পৃঃ ৯)

(৫) বেহেস্তের বিচে সে হইবে মকবুল*

আর তার জত গুনা সব হইবে মাফ ॥ (*নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ২)

(৬) মাবিয়া বসিয়া ছিল রাছুল হুজুরে।

শুনিয়া সওগন্দ মর্দ্দ করিল দরবারে ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১০৯)

(৭) আমি ভি খছমের করিব তাবেদারি ॥

মরতবা পাইব তবে খোদার হুজুরি * (*নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ১৫)

Dhaka University Institutional Repository


ঙ) উর্দু বা হিন্দি ধাতুর ব্যবহার। যেমন- নিকাল্, উতার্, গির্, তোড়্, পাকড়্, ভেজ্, খিচ্ প্রভৃতি।

(১) ফাঁকি দিয়া বিবি তারে নেকালিয়া যায় ॥
ফিরিয়া আসিয়া চোর করে হায় *(*দেলারাম*, পৃঃ ৩৪)

(২) এয়ছাই ভাবিয়া বিবী দেলে আপনার ॥
ছাতি হৈতে উতরিল হইয়া হুশিয়ার * (*জৈগুনের পুঁথি*, পৃঃ ১১)

(৩) দুনিয়া আন্ধার দেখে গিরিয়া জমিনে ॥
দম নাহি চলে যেন জীউ নাহি তনে * (*জৈগুনের পুঁথি*, পৃঃ ১১)

(৪) পশ্চিম তরফ চলি গেল নেকালিয়া ॥
সেখানেতে বিবির জুতা আছিল গিরিয়া *(*দেলারাম*,পৃঃ ৩৪)

(৫) পাকড়িয়া ইমামের মারিব গর্দান
আমার মহবুবে নেকা কৈল কি কারণ ॥ (*জঙ্গনামা*,পৃঃ ১৪৮)

(৬) আমাকে ভেজিয়া দিয়া শহর মদীনা ॥
এরেমে চলিয়া গেল হানিফা মরদানা *(*জৈগুনের পুঁথি*, পৃঃ১০১)

(৭) পহেলা ভেজিল গোরে দরূদ সালাত ॥
মোনাজাত করে ফের উঠাইয়া হাত * (*জৈগুনের পুঁথি*, পৃঃ ৬৩)

(৮) হাসানেরে মারিবেক জহর পেলাইয়া ।
হোসেনেরে (মারিবেক) তলওয়ার খেচিয়া ॥(*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১০৮)

(৯) শুনিয়া বাদশার বেটী জ্বলিল গোশ্বয় ॥
খেঁচিয়া ধারাল নেজা মারে হানিফায় *(জৈগুনের পুঁথি, পৃঃ ১১)

(১০) ঠাঁই ঠাঁই গাড়াইল ঝান্ডা ও নিশান ।
উতারিল লোক সব দেখিয়া ময়দান ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৫৬)

(১১) তাদিকে ডাকিয়া গিধি করিল ফরমান ।
হাসান আলীকে গিয়া পাকড়িয়া আন ॥(*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৫৫)

Dhaka University Institutional Repository


চ) আরবি, উর্দু, ফারসি শব্দের নাম ধাতুরূপে ব্যবহার । যেমন- খোসালিত, গোজরিয়া ও নেওয়াজিয়া।

(১) এহি মতে কত দিন গুজারিয়া যায় ।

দেখ এক তামাসা পয়দা করেন খোদায় *(*দেলারাম*, পৃঃ ৩)

(২) তাহাদের তাবেদারি জে জন করিবে ॥

খোসালিত দেলে সবে বেহেস্তে জাইবে *(*নেকবিবির*, কেচ্ছা, পৃ-২)

(৩) নেওয়াজিয়া রাখ মোরে করিয়া নেহাল ।

আমি আর যত আছে সেহেলী আমার ॥(*জৈগুনের পুঁথি*, পৃঃ ২৪)

(৪) এয়ছাই কয়েক রোজ গোজারিয়া যায়।

আল্লা নবী বল সবে দিন বয়ে যায় ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ৯৮)

(৫) নূরনবী মোহাম্মদ কুফরে করিয়া জব্দ।

রহে নবী খোসালিত হইয়া ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১১৮)

(৬) আল্লাতালা নেওাজিয়া, হায়াত মোবাদ দিয়া রাখে, তোমায় চিরকাল সাহানা ॥

কহা শুনা দুইজনে, হইল খোসাল মনে, আল্লাতালা পুরাইল বাসনা। (*দেলারাম পৃঃ*২৬)

ছ) আরবী ও ফারসী শব্দের বহুবচন রূপে ব্যবহার- বেরাদরান, এজিদান, শহীদান, কুফরান, মোমেমিন, চাকরান ইত্যাদি।

(১) বে-হিসাব এজিদানে ডালিল মরিয়া।

আখেরে আজিজ হইল পানি না পাইয়া ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ২১১)

(২) ঘোড়ায় শুনিয়া হাঁক যত কুফরান।

বলে আজ কদাচিত না বাঁচিবে জান ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ২১৪)

(৩) হোসেনের হাল পরে কাতর থাকিবে।

শহীদান রাহেতে যে দানা বিলাইবে ॥ (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ২৫৯)

জ) পুঃলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দের প্রয়োগ । যেমন-

নামজাদায় > নামজাদী

বাদশাজাদা > বাদশাজাদী

ঝ) সংখ্যা বাচক- পয়লা, দোছরা, তেছরা প্রভৃতির ব্যবহার ।

(১) পহেলা আমরা সবে তোমার নোহারে ।

আগু হইয়া শির দিব আল্লা যাহা করে (*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৯৪)

(২) দোসরা সেফাই এই আইল নেকালিয়া ।

ওহাব দেখিয়া তারে কহিল হাঁকিয়া ॥(*জঙ্গনামা*, পৃঃ ২০২)

(৩) এয়ছাই আমার পরে আল্লার ফরমান ॥

পহেলা আসিয়া যে বরকত উঠাইব।

দোসরাতে আওরাতের সরম লিয়া যাব ॥

তেসরাতে উঠাইব সাখাওতি কাম।(*জঙ্গনামা*, পৃঃ ১২৮)

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে শুধু ভাষা-বৈশিষ্ট্য নয়, আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্যও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়-

ক) দোভাষী পুঁথি বাংলা হরফে লেখা এবং আরবি-ফারসি বইয়ের মত ডানদিকে থেকে বাম দিকে ছাপা হতো। দোভাষী পুঁথিগুলো ছাপা হতো বেশ বড় বড় হরফে।

খ) দোভাষী পুঁথি প্রথম হামদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তারপর না'ত অর্থাৎ রাসুলের গুণকীর্তন দিয়ে শুরু হত। ভণিতায় লেখকের নাম প্রদান করা হয়। তাছাড়াও গ্রন্থের শুরুতে বা শেষে লেখকের আত্মজীবনী (যেমন-শায়েরের বিবরণ) থাকে। যেমন ঃ

অধিন গরিব কহে ভাবিয়া খোদায় ॥

রহমত গঞ্জে ঘর সহর ঢাকায় *

এই খানে কেতাব ভ'ই হইল তামাম ॥

ছোট বড় সবাকারে আমার ছালাম *

(*নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ২৮)

Dhaka University Institutional Repository


গ) দোভাষী পুঁথিগুলো সাধারণত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। তবে কাব্য-মধ্যে দোভাষী পুঁথিকারগণ একই ছন্দের একঘেয়েমী দূর করার জন্য যমক, তোটক ও চৌপদী ব্যবহার করেছেন ।

ঘ) দোভাষী পুঁথির প্রচ্ছদে চারপাশে ছিল লতাপাতার বর্ডার। উপরে আসল, ছহি, বড় ইত্যাদি বড় বড় করে হরফে লেখা থাকত।

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে দুজন আদি লেখকের মধ্যে শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দোভাষী পুঁথির প্রথম লেখক শাহ গরীবুল্লাহর কাব্য পাঠ করে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা কঠিন। সৈযদ হামজা রচিত আমীর হামজা (দ্বিতীয় খন্ড) কাব্যে শাহ গরীবুল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। গরীবুল্লাহর জন্ম হাওড়া জেলার বালিয়ার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামে।

আল্লার মকবুল সাহা গরীবুল্লাহ নাম।
বালিয়া হাফেজপুর জাহার মোকাম ॥
আছিল রওসন দেল সাএরি জবান।
জাহাকে মদদ গাজী সাহা বড়ে খান ॥
সাএরি করিলেন পুথি আমীর হামজার।
না ছিলো কেতাব কহ তামাম কেচ্ছার ॥[১৫]

তাঁর পিতার নাম শাহ দুন্দী এবং তিনি বড় খাঁ গাজীর ভক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায় *'জঙ্গনামা'* কাব্যে ।

অধীন ফকির কহে, গাজী ধেয়াইয়া ॥
বাপ নাম শাহা দুন্দি আল্লার ফকির।
ভাটির সুলতান গাজী বড় খান পীর ॥[১৬]

শাহ গরীবুল্লাহ মোট কটি পুঁথি রচনা করেছেন তা নিয়ে পন্ডিত মহলে মতভেদ

১৫। সৈয়দ হামজা ঃ *আমীর হামজা* (২য় খন্ড), পৃঃ ১৪৬।
১৬। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *জঙ্গনামা*, পৃ ঃ ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository


রয়েছে। দোভাষী পুঁথি প্রকাশকদের কারসাজির ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যের ভণিতা থেকে প্রমাণ সাপেক্ষে তাঁর পাঁচটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যথা- (ক) *সোনাভান* (খ) *আমীর হামজা* (প্রথম খন্ড) (গ) *ইফসুফ-জোলেখা* (ঘ) *জঙ্গনামা* (ঙ) *সত্যপীরের পুঁথি*।

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর '*বাংলা সাহিত্যের কথা*'য়(দ্বিতীয় খন্ড) উপরোক্ত পাঁচটি পুঁথির উল্লেখ করেছেন।[১৭]

ড: গোলাম সাকলায়েন কবির জন্ম আনুমানিক ১৬৯০-৯৫ খ্রিষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৭৭০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলে অনুমান করেছেন।[১৮]

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, কবি (১৬৭৫-১৭৭৫) খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[১৯]

ড: আহমদ শরীফ অনুমান করেছেন, কবি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[২০]

শাহ গরীবুল্লাহর পর সৈয়দ হামজা কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কবির রচিত 'জৈগুনের পুঁথি' কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে জানা যায়। সৈয়দ হামজা ১৭৩২-১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। হুগলী জেলার অদুনা বা উদনা গ্রামে তাঁর জন্ম । কবির পিতার নাম হেদায়তুল্লাহ। তিনি তাঁর রচিত কাব্যের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

ক। ভরশূট পরগনা বিচে উদুনা বাগের নিচে ।

বসবাস কদিমি মোকাম ॥

---

১৭। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ *বাংলা সাহিত্যের কথা*(দ্বিতীয় খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭১, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, পৃঃ ২৮৩-২৯২।

১৮। গোলাম সাকলায়েন ঃ *মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৭, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃঃ ৮৭-৮৮।

১৯। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ২৮৩-২৯২।

২০। আহমদ শরীফ ঃ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (দ্বিতীয় খন্ড), প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ২৮৩-২৯২।

Dhaka University Institutional Repository


আবদুল কাদের দাদা যার বড় দেল সাদা।
বাপ মেরা হেদাতুল্লা নাম ॥
কলিমদ্দি বড়া বেটা কুতুবদ্দি তার ছোটা।
এই দুই মাছুম আমার ॥[২১]

খ। হানিফার পাঙতলে, সৈয়দ হামজা বলে,
ভরপুট পরগণা যার ঘর।
উদনায় বসতি ছিল বানেতে খারাব হৈল,
তিন হাত বাড়িল উপর ॥[২২]

গ। রাসুলের পাঙতলে, সৈয়দ হামজা বলে,
ঘর ছিল ভরপুট পরগণা ॥
সন নিরান্নবই সালে, আমার কপাল ফলে,
বাড়িতে পড়িল তিন হানা *
চাষাবাদ যত ছিল, বাড়ি ঘর সব গেল,
ভরা ডুবি হৈল মাঝ মাঠে ॥
দেলেতে আফসোস বড়া, হইয়া যে গাঙ ছাড়া,
পরগণা বাড়েয়া রাহে ঘাটে।[২৩]

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, কবি ১৭৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪]

আহমদ শরীফের মতে, ১৭৮৮-১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবি তাঁর বিভিন্ন কাব্য রচনা করেছেন।[২৫]

---

২১। সৈয়দ হামজা ঃ *জৈগুনের পুঁথি*, ১৯৬১, পৃঃ ২৩
২২। সৈয়দ হামজা ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯।
২৩। সৈয়দ হামজা ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৪।
২৪। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ঃ *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খন্ড), পৃঃ ২৯৪।
২৫। আহমদ শরীফ ঃ *পুঁথি পরিচিতি*, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository


আনিসুজ্জামানের মতে, সৈয়দ হামজা ১৭৩৩-১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬]

সৈয়দ হামজা চারটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর *'মধুমালতী'* কাব্যটি সাধু ভাষায় রচিত। এছাড়া, গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত *'আমীর হামজা'* (দ্বিতীয় খন্ড), *'জৈগুনের পুঁথি'* ও সর্বশেষ *'হাতেম তাই'* কাব্য রচনা করেন। কবি সৈয়দ হামজা সর্বশেষ কাব্যে (*হাতেম তাই*) তাঁর রচিত কাব্যগুলির নাম উল্লেখ করেছেন–

কেচ্ছা মধুমালতীর জঙ্গনামা আমীরের
জৈগুনের পুঁথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভাল করে যাহার খায়েশ পরে,
হাতেম লিখিনু শেষ ভাগে ॥[২৭]

আমরা জানি, মুসলমানেরা তখন সাধু বাংলায় কাব্য চর্চা না করে প্রধানত দোভাষী রীতিতে বই লিখেন । এর পাঠক ছিলেন স্বল্পভাষা-জ্ঞানসম্পন্ন, অল্প শিক্ষিত মানুষ। পুঁথি সাহিত্যের লেখকরা যেমন একদিকে বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন না, অন্যদিকে পাঠকরা নিম্নবিত্ত সমাজের সাধারণ মানুষ ছিল । সাহিত্যের সংজ্ঞা তাদের কাছে অপরিচিত ছিল। সাহিত্য পাঠের অভীপ্সা নিয়ে তাঁরা দোভাষী পুঁথি পড়ত না । তাঁরা তাদের নিজেদের মত করে লেখা সহজ সরল ভাষায় যেসব কাহিনী বা তথ্য, বক্তব্য বা উপদেশ প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল। সাধু সাহিত্য পাঠের আগ্রহ তাদের জন্মে নি। কাহিনীর প্রতি চিরন্তন আকর্ষণ ও অন্য বিষয়ে জানার জন্য তারা পড়ত। এই পাঠাভ্যাসের ফলেই দোভাষী পুঁথি পাঠের প্রতি আগ্রহ বা সম্মানবোধ তাদের জাগে। এই সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন-

"পুঁথি সাহিত্যের অমর অবদান হইতেছে মধ্যযুগের শেষ পাদে ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম রাষ্ট্রীয়

---

২৬। আনিসুজ্জামান ঃ *মুসলিম মানস ও বাংলা সহিত্য*, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ,২০০১ পৃঃ ১০৯।
২৭। সৈয়দ হামজা ঃ *হাতেম তাই*, পৃঃ ২৯৮।

শক্তি ও তেজোদীপ্ত ইংরেজ শাসনের আবর্তনে ভগ্নমনউদ্দম সম্প্রদায়কে মুসলিম ঐতিহ্যমূলক কথা কাহিনীতে অনুপ্রাণিত করা। ইহারই ফলস্বরূপ ফরাযী আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনকালে পুঁথি সাহিত্য গণ-মানসে গণ-সাহিত্যের ভূমিকা পালন করিয়াছে।"[২৮]

পুঁথি সাহিত্য একদিকে যেমন সাধারণ অন্তজ এবং নিম্নবিত্তের মানুষের চিত্ত বিনোদন সাধন করত। অন্যদিকে এই পুঁথি সাহিত্যে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসেরও বিশেষ মূল্যবান উপকরণ হয়ে আছে। একারণেই দোভাষী পুঁথি অবলম্বনে সেকালের নারীর অবস্থান, প্রকৃতি এবং ভূমিকা উদ্‌ঘাটন আলোচ্য গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

---

২৮। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খন্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ঃ ৩১৩।

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীর অবস্থান

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সমাজে নারীর অগ্রগতি সাধনে বিশেষ করে হিন্দু নারীর সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহে উৎসাহ দান, সহমরণে বাধ্য করা এই সব সামাজিক নিগ্রহ বিদ্যমান ছিল। এসব সামাজিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে তাঁরা অবস্থান নিয়েছিলেন। দেশ ও জাতি গঠনে নারী সমাজের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা তাঁরা বুঝতে পেরে নারী জাতির অধিকার রক্ষার্থে কলম ধরেছিলেন। রামমোহন সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে সফল হয়েছিলেন । তিনি সতীদাহ প্রথার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে দুইটি বই লিখেন- *'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'*(১৮১৯) এবং *'গোস্বামীর সহিত বিচার'*(১৮১৮)। বিদ্যাসাগরের অন্যতম অবদান বহুবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহের প্রবর্তন । সতীদাহ প্রথা ও বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন এবং বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধকরণ যে নারী জাতির অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিল এ বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। সমালোচকের ভাষায়-

404177

> বাংলার নারী সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্ভ্রম ও স্বাধিকার বোধ প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে একদিকে যেমন এসব কদাচার রোধ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে হবে, এ চেতনা বিদ্যাসাগরের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা যায়।[১]

কলকাতার নারী-শিক্ষা-কেন্দ্র 'বেথুন কলেজ' বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত

---

১। মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*,দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃঃ ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository


হয়। বিদ্যাসাগর রচিত সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলী হলো 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'(প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব)। দুটি গ্রন্থেরই রচনা ও মুদ্রণকাল ১৮৫৫ সাল। এছাড়া,*'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'* (১৮৭১)*'অতি অল্প হইল'*(১৮৭৩), *'আবার অতি অল্প হইল'* (১৮৭৩) নামে কয়েকটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। এভাবেই নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন সমাজ–সংস্কারক রামমোহন ও বিদ্যাসাগর।

মুসলমান সমাজে নারীদের প্রতি নিগ্রহের স্বরূপ ছিল ভিন্ন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। এছাড়াও নারী জাতিকে গৃহের অভ্যন্তরে অন্তরীণ রাখা মুসলমান সমাজের প্রধান নিগ্রহ ছিল। এই অবরোধ প্রথার পিছনে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান আরোপিত হয়েছে । যদিও ইসলাম ধর্মে পর্দা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য পালনীয় একটি ধর্মীয় বিধান, তথাপি এই পর্দা প্রথা শুধু মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। পর্দা সম্পর্কে কুরআন মজিদের সূরা নূরের আয়াতটি উল্লেখ করা চলে-

> মু'মিনদিগকে বল ,তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম । উহারা যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত (সূরা নূর, আয়াত ৩০)[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়কে সংযত দৃষ্টি এবং শালীন ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় আমাদের দেশের মুসলিম সমাজে বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পর্দার নামে নারীদের অবরোধ প্রথার সম্মুখীন হতে হয়। এই অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বেশ কয়েকজন মহিলা সোচ্চার হন । যাঁরা নারীর অধিকার, মর্যাদা , শিক্ষা ও

---

২। *আল- কুরআনুল কারীম ঃ* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ,২০০২, পৃঃ ৫৬৪।

Dhaka University Institutional Repository



চিরাচরিত ঐতিহ্যের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এঁদের মধ্যে ফয়জুন্নেসা চৌধুরী (১৮৩৪-১৯০৪), করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২২) ও বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)-র নাম উল্লেখযোগ্য।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরী (১৮৩৪-১৯০৪) কুমিল্লা জেলার হোসনাবাদ পরগনায় লাকসামের পশ্চিম গাঁয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ফয়জুন্নেসা কঠিন পর্দা প্রথার মধ্যে থেকেই বাংলা, ইংরেজি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। ১৮৭৩ সালে ফয়জুন্নেসা কুমিল্লায় একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের সঙ্গে তিনি হোস্টেল তৈরি করেন এবং মেয়েদের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন । এছাড়াও কুমিল্লা সদর হাসপাতালের 'মহিলা ওয়ার্ড' তাঁর আর্থিক সাহায্যে নির্মিত হয়।[৩] তিনি *'রূপজালাল'* (১৮৭৬)নামে একটি রূপক জাতীয় রচনা এবং *'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত'* (১৮৮৭) শিরোনামে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ লিখেন । বিদ্যালয় স্থাপন, পথঘাট নির্মাণ, মসজিদ ও মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সমাজসেবামূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫–১৯২২) রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের মোহাম্মদ আবু সাবেরের মেয়ে ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বড় বোন। তিনি নিজের একান্ত চেষ্টায় বাংলা ও ইরেজি শিক্ষা অর্জন করেন। করিমুন্নেসা খানম বেগম রোকেয়াকে শিক্ষা গ্রহণে সহযোগিতা করেন । তাঁর দুই কৃতী সন্তান ছিলেন আব্দুল করিম গজনভী (১৮৭২–১৯৩৯) ও আব্দুল হামীদ গজনভী (১৮৭৪–১৯৫৮)। মায়ের একান্ত চেষ্টায় তাঁরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায়

---

৩। ওয়াকিল আহমেদ ঃ *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository



আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর সম্পাদনায় *'আহমদ'* (১২৯৩) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। *'দুঃখ তরঙ্গিনী'* ও *'মানস বিকাশ'* নামে তাঁর দুটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে।[৪] বেগম রোকেয়া সম্পর্কে এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মুসলিম নারী জাগরণের সূচনা পর্বে যে সকল সমিতি নারী জাগরণের ক্ষেত্রে অবদান রাখে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমিতি তিনটি হচ্ছে--

১। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশান (১৮৭৮)

২। ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩) ও

৩। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩)।

নিম্নে সমিতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদত্ত হলো-

**১। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশান (১৮৭৮) ঃ** এই এসোসিয়েশানের সভাপতি ছিলেন নবাব আমীর আলী ও সহ সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আমীর হোসেন । এটি মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও সমাজ ও শিক্ষা এর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। নারী শিক্ষার জন্য এই সমিতি কাজ করেছে । নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে নারী প্রগতির ধারাকে এগিয়ে নেয়াও এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মুসলিম নারী সমাজের জাগরণেও সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

**২। ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩) ঃ** ঢাকা-কেন্দ্রিক এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন আবদুল মজিদ ও সভাপতি ছিলেন হিম্মত আলী । মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল । সেই উদ্দেশ্য সাধনে এই সম্মিলনী মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে উদযোগী হয়। কারণ সে সমাজে পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণে বাধা না থাকলেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবল অসহযোগিতা ও বিরোধিতা বিদ্যমান ছিল। প্রথম বছরে সম্মিলনীর প্রধান কাজ ছিল স্ত্রী–শিক্ষা বিস্তার । সমিতি প্রথম শ্রেণী

৪। ওয়াকিল আহমেদ ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৮০,৮১।

Dhaka University Institutional Repository



থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পঠ্য তালিকা নির্বাচন এবং উক্ত তালিকা অনুসারে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয় । বাংলা এবং উর্দু এই দুই ভাষার মাধ্যমেই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল । পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ –

"১। বঙ্গবাসী যে কোন মুসলমান মহিলা নির্বাচিত পুস্তকের পরীক্ষা নিয়ম মত দিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

২। মহিলাগণ আপন আপন অন্তঃপুরে থাকিয়া স্ব স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারিবেন ।

৩। মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৪। কোন পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষার সময় পুস্তকের, কোন ব্যক্তির অথবা অন্য কোন প্রকারের সাহায্য গ্রহণ করিলে তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হইবে না।"[৫]

পরীক্ষার এই নিয়ম অনুযায়ী ঢাকা, বরিশাল , নোয়াখালি , ময়মনসিংহ এবং কলকাতায় মোট ৩২ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল –১৪ জন উর্দু ভাষায় ও ২৩ জন বাংলা ভাষায় । তার মধ্যে উর্দু বিভাগে ১২ জন এবং বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল । কৃতী ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল । এই সমিতির স্ত্রীশিক্ষার জন্য পাঠ্যতালিকা প্রণয়ণ ও পরীক্ষা গ্রহণের এরূপ ব্যবস্থা সমসাময়িক কালে অমুসলমান সমাজের অনেক সমিতি বা সম্মিলনীরই কার্যপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এরূপ সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'শুভসাধিনী সভা' (প্রতিষ্ঠা–১৮০৯), 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' (প্রতিষ্ঠা– ১৮৭০), 'গৈলা ছাত্র সম্মিলনী সভা' (প্রতিষ্ঠা –১৮৮০)।

মুসলামন সমাজে তখন পাঠ্য বইয়ের অভাব ছিল । এজন্য মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ বালিকাদের শিক্ষার জন্য 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর'র অনুরোধে *'তোহফাতুল মোসলেমিন'* (১৯২০) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম

৫। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ *চকবাজারের কেতাব পট্টি,* প্রথম প্রকাশ ১৯৯০,জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃঃ ৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository



বছর এই সম্মিলনীর ৪টি অধিবেশন হয়. ৪র্থ অধিবেশনে 'স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা' সম্পর্কে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহ বক্তৃতা দেন। এভাবেই এই সমিতি নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণা চালায়।

৩। **বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি (১৯০৩)ঃ** এই সমিতির সভাপতি ছিলেন মির্জা সুজাত আলী বেগ খান বাহাদুর ও সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন । এই সমিতির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষার প্রসার ও সেজন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । এই সম্মেলনের একটি অন্যতম প্রস্তাব 'স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।'[৬] এই সমিতির উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসার ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুরুষ সমাজে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে নারী-মুক্তি ও স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুমতাজ আলী । মুমতাজ আলী সম্পাদিত *'তাহজিব আন-নিঁসওয়া'* নামক সাময়িকপত্র নারী জাতির শিক্ষা ও স্বার্থের অনুকূলে বাস্তব ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। *'হুকুক-ই-নিসওয়া'* (নারীদের অধিকার) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। নারী-পুরুষের আইনগত সমতা দাবী করে প্রচলিত সনাতন সংস্কারসমূহকে ভিত্তিহীন বলে দাবী করেছেন গ্রন্থাকার । তাঁর মতে, পুরুষ যেমন 'নবুওয়ত' লাভের মত কিছু কিছু অনন্য মর্যাদার অধিকারী, নারীও তেমনি গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের মত কতিপয় অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের আধার।[৭]

---

৬। ওয়াকিল আহমেদ ঃ *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৭, পৃঃ ১৮০-১৮২।

৭। মুহাম্মদ শামসুল আলম ঃ *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository



সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৯) নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। তিনি ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে' সভাপতির ভাষণে বলেন যে, মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরাল ভাবে চলা উচিত । তাতেই সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হবে, পুরুষ নারী একত্রে সমভাবে উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না। বরং এক অংশকে শিক্ষিত ও অপর অংশকে নিরক্ষর রাখলে ফল মারাত্মকই হবে। শিক্ষিত অংশ আনন্দ লাভের জন্য অসামাজিক আচরনের দিকে ঝুঁকে পড়বে।[৮]

শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) একদিকে যেমন নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর করেন, অন্যদিকে তেমনি বাঙলার মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে উৎকর্ষ সাধনে উদযোগী হন। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে 'বেথুন সোসাইটি' যে ভূমিকা রেখেছিল তার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।[৯]

স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী ও আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজের নারী জাগরণের পক্ষে কাজ করেন । ফলে নারী প্রগতির পথ কিছুটা উন্মুক্ত হলেও বেগম রোকেয়াকে নারী মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যেতে হয় । তিনি বাঙালী মুসলিম সমাজে নারী জাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন । সে-কালে পর্দা বা অবরোধ প্রথার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বেগম রোকেয়াকে । অবরোধ প্রথা প্রসঙ্গে তিনি 'অবরোধ বাসিনী' প্রবন্ধে বলেন –

> সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রী লোকদের হইতে পর্দা করিতে হইত। তাই কিছুই বুঝিতাম না যে , কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দা

---

৮। Syed Ameer Ali M.A.C.I.E –Muhammadan Education and Muhammadan Society (Presidential Address delivered at Muhammadan Educational Conference of 1899, Calcutta, 1900). দ্রষ্টব্য ওয়াকিল , উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃঃ ৪৯৬,৪৯৭।

৯। বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, প্রথম খন্ড ,১৯৬০ পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository



করিতে হইত। .....পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ির কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণভয়ে যত্রতত্র – কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম। বাচ্চাওয়ালী মুরগী যেন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবা মাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নীচে পালায়, আমাকেও সেইরূপ পলাইতে হইত। কোন সময় চক্ষের ইসারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পালাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরব্বীগণ,"কলিকালেরমেয়েরা কি বেহেয়া, কেমন বেগয়রৎ" ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।[১০]

মুসলিম সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না। নারীদের মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজ তখন সচেতন ছিল না। যদিও রাসূল্লাহ (সাঃ) বিদ্যা অর্জনের জন্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে চীন দেশে যাওয়ার কথা বলেছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিকাশে তখন অনেক অন্তরায় ছিল। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় সামগ্রিক ভাবেই অনেক পশ্চাৎপদ থাকায় বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল । ১৮৮১-৮২ সালের শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মুসলিম মেয়েদের হিসাব অন্য মেয়েদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে উল্লেখ করেছেন স্যার আজিজুল হক(১৮৯২-১৯৪৭) তাঁর *'হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রব্লেমস্ অব মুসলিম এডুকেশন ইন বেংগল'*[১১] বইয়ে–

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | মোট ছাত্রী সংখ্যা | মুসলীম ছাত্রী সংখ্যা | মুসলীম মেয়েদের হার |
|---|---|---|---|
| উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৮৪ | - | - |
| মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ৩৪০ | ৬ | ১.১ |
| দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ৫২৭ | ৬ | ১.১ |
| দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৭,৪৫২ | ১৫৭০ | ৮.৯ |

১০। আবদুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী *"অবরোধবাসিনী"*, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩, বাংলা একাডেমী,পৃঃ ৪৮৮,৪৮৯।

১১। মালেকা বেগম ঃ *বাংলার নারী আন্দোলন*, মহিউদ্দীন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃঃ ৪৭,৪৮।

*Dhaka University Institutional Repository*



স্ত্রী–শিক্ষা বিকাশে তখন অনেক অন্তরায় ছিল। অল্প বয়সে মেয়েদের অন্তঃপুরে বন্দীত্ব জীবন যাপন করতে হতো। তাই মেয়েদের বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ কম ছিলো। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (১৮৪৩) *বামাবোধিনী পত্রিকা* (১৮৬৩) সমাজে নারী-স্বাধীনতা এবং নারী-মুক্তির পক্ষে কাজ করে। মুসলিম মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র *'অন্নেসা'* প্রকাশের তারিখ বৈশাখ ১৩২৮ (এপ্রিল ১৯২১) সম্পাদিকা ছিলেন বেগম সোফিয়া খাতুন। নারী জাতির সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেনিবেদিত ছিল এই সাময়িকী। সমকালে মুসলমানদের পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাসমুহের মধ্যে *'সুধাকর'*(১৮৮৯) *'কোহিনূর'*(১৮৯৮), *'নবনূর'*(১৯০৩), *'মোহাম্মদী'*(১৯০৩) ও *'আল-এসলাম'*(১৯১৫) প্রভৃতির অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাঙালী মুসলিম সমাজে নারীর বিকাশ ও উন্নতিতে *'সওগাত'*(১৯১৮) প্রত্রিকা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী কালে ১৩৩৬ সালে 'মহিলা *সওগাত*' প্রকাশিত হয়, যা কি না বাঙালী মুসলিম নারীর জন্য এক বৈপ্লবিক অধ্যায়।

ইসলাম ধর্মে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য বিদ্যার্জন অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষিত। কিন্তু মুসলিম সমাজে পুরুষদের জন্য শিক্ষার কিছুটা সুযোগ থাকলেও মহিলাদের জন্য তেমন কোন সুযোগ ছিল না। এপ্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া তাঁর'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন-

> আমাদের জন্য এদেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ–প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরআন শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখীর মত আবৃত্তি কর। কোন পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে "হাফেজা" করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরআনখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই "হাফেজ"। আমাদের আরবী শিক্ষা ঐ পর্যন্ত। পারস্য ও উর্দু শিখিতে হইলে, প্রথমেই "করিমা ববখ্শা এ বরহালে মা" এবং একেবারে (উর্দু) "বানতন্

Dhaka University Institutional Repository



নাস" পড়। একে আকার ইকার নাই,তাতে আবার আর কোন সহজ পাঠ্যপুস্তক পূর্বে পড়া হয় নাই, সুতরাং পাঠের গতি দ্রুতগামী হয়না। অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই কন্যা-জীবন শেষ হয় (অর্ধাঙ্গী)।[১২]

বেগম রোকেয়া সেকারণেই নারী শিক্ষার বিকাশে যথার্থ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল"(১৯১১) স্থাপন করেন। 'বোরকা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-

> আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া অবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন(ওরফে বোরখা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই।... শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি।.....তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা জেনানা স্কুলের আয়োজন করা হোক (বোরকা)।[১৩]

বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পর্দা ও অবরোধের মধ্যে যে একটি যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য রয়েছে তা উপস্থাপন করেছেন। কোন সমাজে নারী পর্দাশীল না হলেই যে তারা উন্নত হবে এমন কথা বলা চলে না। পর্দাশীল না হয়েও অনেক সমাজের নারীগণ অবরোধে বন্দিনী থাকেন এমন দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি পার্সি মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন-

> পূর্বে তাহারা ছত্র ব্যবহারেরও অধিকারী ছিলেন না, তারপর তাহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু ত পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই । এখন পার্সি মহিলাদের পর্দা মোচন হইয়াছে সত্য , কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই(অর্ধাঙ্গী)।[১৪]

---

১২। আবদুল কাদির সম্পাদিতঃ *রোকেয়া রচনাবলী*, *'অর্ধাঙ্গী'* প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩,বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃঃ ৪১,৪২।

১৩। আবদুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী 'বোরকা' প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩, বাংলা একডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৬০,৬১,৬২।

১৪। আবদুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী 'অর্ধাঙ্গী' প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩,বাংলা একাডেমী, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository



বেগম রোকেয়া বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা ছাড়াও বিভিন্ন স্তরে নারীদের মধ্যে পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেন। তিনি ১৯১৬ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি। 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন' নারী জাতির সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক ও আইনগত অধিকারের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।[১৫]

বেগম রোকেয়ার পূর্বে লেখনী ধারণ করেছিলেন খুলনার আজিজন্নেসা খাতুন। তিনি ইংরেজ কবি পার্নেলের *'হারমিট'* কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন *'উদাসীন'* (১৮৮৪) নামে।[১৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মহিলা কবি খায়রুন্নেসা । তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *"সতীর পতি ভক্তি"* । তিনি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী থাকাকালীন সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখেছেন। তিনি গৃহ ধর্ম প্রতিপালনের জন্য যে ফিরিস্তি দিয়েছেন তাতে বলেছেন –

১। যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা দুঃখ পায় সেই পরিবার ত্বরায় উৎসন্ন যায়।

২। স্ত্রীলোক কেবল সন্তানের প্রসূতি নহেন, সকল কার্যের প্রসূতি।[১৭]

বেগম রোকেয়ার সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনায় নারীশিক্ষা বিষয়ে আধুনিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬) সম্পাদিত একটি অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা *'নবনূর'*(১৯০৩-০৬)। তিনি নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই নবনূরের একজন প্রধান লেখিকা ছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি *"তাপসী রাবেয়া"*(১৯১৭), *"ডালি"*(১৯২৩), *"হাফেজা"*(১৯২৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর *"হাফেজা"* উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হচ্ছে একজন

---

১৫। মুহাম্মদ শামসুল আলম ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৮।

১৬। মুহাম্মদ শামসুল আলম ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬৪।

১৭। মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন ঃ *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, প্রথম খন্ড ১৯৬০,পৃঃ ২০৬,২০৭।

Dhaka University Institutional Repository



মহিলা তার বিপথগামী স্বামীকে কিভাবে সংসারমুখী করে তোলে।

কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) *'আবদুল্লাহ'* উপন্যাসে নারী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে কাদেরের স্ত্রী হালিমা নায়ক আবদুল্লার শুধু ভগিনী নন, তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একজন প্রগতিবাদী নারী। তিনি বাংলায় চিঠি লিখতে ও পড়তে পারতেন । তিনি কুসংস্কারের বিরূদ্ধে দন্ডায়মান ছিলেন।

সাহিত্যিক নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩)বিখ্যাত উপন্যাস *"আনোয়ারা"* ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। *'গরীবের মেয়ে'* ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। *আনোয়ারা* ও *গরীবের মেয়ে* উপন্যাস দুটিতে ইংরেজী শিক্ষা ও নারী শিক্ষার প্রতি জোড়ালো সমর্থন করা হয়েছে। নজিবর রহমান ইংরেজী শিক্ষা ও নারী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় নিজ গ্রামে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন (১৮৯২) যা পরবর্তীকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।[১৮]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) সমাজের প্রধান সমস্যা যে নারী শিক্ষার অভাব, তা বুঝতে পেরেছিলেন । তিনি *'স্ত্রীশিক্ষা'*(১৯১৬) নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রথমে বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হয়, পরে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই গ্রন্থ মুসলমানদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। তিনি তাঁর কন্যাদেরকে শিক্ষিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। স্ত্রী–শিক্ষার সঙ্গে তিনি স্ত্রী–স্বাধীনতারও পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলেছেন আমাদের দেশে তৎকালীন সময়ে যে পর্দা- প্রথা ছিল তা ইসলামসম্মত নয়।[১৯] তিনি তুরস্কের প্রগতিশীল নারী জীবন অবলম্বনে *'তুর্কী নারী জীবন'* (১৯১৩) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থ নারী কল্যাণের শুভ আন্দোলনের স্বাক্ষর রেখেছে।

---

১৮। ওয়াকিল আহমদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭।

১৯। মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন ঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,প্রথম খন্ড, প্রকাশ কাল ১৯৬০, পৃঃ ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository



লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) নারীর অধিকার ও ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

> "পরিত্যক্তা নারীদেরকে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি 'নারীতীর্থ' (১৯২২) নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন বেগম রোকেয়া এবং সম্পাদক ছিলেন লুৎফর রহমান। তিনি পতিতা নারীদেরও স্বনির্ভর করে তোলার জন্য ৫১ নং মির্জাপুর স্ট্রীটে 'নারীশিল্প বিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন। একজন দরজি রেখে তিনি পতিতা নারীদের জামা তৈরি করার পদ্ধতিশেখানোর ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তিনি চরকায় সুতা কাটা ও বই বাঁধাই এর কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করেন।"[২০]

*'সরলা'*(১৯১৭), *'প্রীতি-উপহার'* (১৯২৭) লুৎফর রহমানের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এ উপন্যাস দুটিতে নারী অধিকারের পক্ষে তিনি কথা বলেছেন–

> যে পুরুষ মুখে নারীকে সমকক্ষ মনে করে অথচ কার্যের বেলায় তাকে সকল দাবী বুঝিয়ে দেয় না, সে পুরুষের মূল্য কি? স্ত্রী পুরুষের চেয়ে কিছুতেই ছোট নয়। তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা আছে।[২১]

লুৎফর রহমান নারীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাসিক *'নারী শক্তি'* (১৯২২) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তিনি *'উচ্চ জীবন'* (১৯২১-২২) গ্রন্থে 'নারী পুরুষ' প্রবন্ধে নারী অধিকার সম্পর্কে বলেছেন–

> নারী যে মানুষের সকল অবস্থার সঙ্গিনী। আহারে-অনাহারে, সুখে-ব্যথায়, সম্মানে-অসম্মানে তার সহানুভূতি চাই, অতএব কোন অবস্থায় তাকে বাদ দেওয়া চলে না।.....নারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমি অনেক স্থানে অনেক কথা বলেছি। নারী স্বাধীনতার অর্থ নারী-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, তাকে শিক্ষিত করা, তার হাত ,পা ও মুখের ব্যবহার করতে দেওয়া।[২২]

---

২০। খোন্দকার সিরাজুল হক সম্পাদিত, *ডাক্তার লুৎফর রহমান*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃঃ ১৫।
২১। *লুৎফর রহমান রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড, প্রীতি- উপহার*, সম্পাদনা ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃঃ ১৩৬।
২২। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত *'লুৎফর রহমান রচনাবলী'* প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃঃ ৭৬,৮১।

*Dhaka University Institutional Repository*



উনিশ শতকের শেষ দিকে গৃহবধূদের মধ্যে যে শিক্ষার আলো সম্প্রসারিত হয়েছিল তার পরিচয় আমরা মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমের জীবনীর মাধ্যমে জানতে পারি। তাঁর স্ত্রী যথেষ্ট রুচিশীল ও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বল্প বিদ্যা নিয়ে মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য চর্চায় বিশেষ প্রেরণার উৎস ছিলেন। মশাররফ হোসেনের বিভিন্ন রচনায় প্রথম শ্রোতা হিসাবে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিলো।[২৩] হয়তো এভাবেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রদীপ বিভিন্ন গৃহে প্রজ্জ্বলিত ছিলো।

বলা বাহুল্য, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ক্রমবর্ধমান মুসলমান সমাজে যে সার্বজনীন ছিল না এবং স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে সর্বসম্মত চেতনার সৃষ্টি হয়নি, তার প্রমাণ দোভাষী পুঁথি। তাই লক্ষ্য করা যায়, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে দোভাষী পুঁথি রচয়িতাগণ সংস্কার মুক্ত হতে পারেননি। তখন মুসলমান সমাজে শুধু ইংরেজী শিক্ষার প্রতি নয়, সার্বিক শিক্ষার প্রতি অনীহা ছিল এবং হীনমন্যতায় তাঁরা আক্রান্ত ছিলেন। তার প্রমাণ দোভাষী কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়।

---

২৩। পৃথ্বীলা নাজনীন ঃ *আত্মজীবনীমূলক রচনা ঃ মীর মশাররফ হোসেন*, প্রথম প্রকাশ-১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ১০৯,১১০।

Dhaka University Institutional Repository

## তৃতীয় অধ্যায়

# দোভাষী পুঁথিতে নারীর অবস্থান

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে আমরা নারীর অবস্থান, ভূমিকা ও অধিকার সম্পর্কে যে-সব তথ্য পাচ্ছি তা এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা গেল। যাঁরা এই সব পুঁথি সাহিত্য লিখেছেন , তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নাগরিক জ্ঞান পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে, সনাতন পদ্ধতিতে দোভাষী পুঁথিতে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিতে নারীর অবস্থান কিরূপ ছিল, তা আমরা দেখব। নারী প্রসঙ্গে লেখকের চিন্তা ভাবনা এবং মনোভঙ্গিও তুলে ধরব।

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে বেশ কিছু নীতিমূলক বা ধর্মীয় বিধি-নিষেধমূলক গ্রন্থ রয়েছে, যাতে ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীর অবস্থান বিচার করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে মালে মুহম্মদের *'তাম্বিয়াতন্নেছা'*, মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিমের *'নছিহতে জানানা'*, ফছীহদ্দীনের *'মেছবাহুল ইসলাম'* এবং মুনশী গরীবুল্লাহর *'নেকবিবির কেচ্ছা'*।

*'নছিহতে জানানা'* গ্রন্থে মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম নারীর স্বাভাবিক চলাচল সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। গ্রন্থকার এই সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে বলেছেন বাড়ি ঘরে বেড়া নির্মাণ করার মূল কারণ নারীকে পর্দার ভিতরে রাখা। তথাপি নারী কেন বাড়িঘর ছেড়ে ঘরের বাইরে বের হন।

" যেখানে সেখানে যায় আওরত যখন ॥
তবে এত বাড়ী ঘর কিসের কারণ *
টাটি দেওয়া বাড়ি ঘেরা যাহার কারণে ॥
সেইত বাহিরে ফিরে সবার সামনে *

Dhaka University Institutional Repository



তেকারণে দানা লোকে বলিয়াছে পাট ॥
যার জন্য টাটি দিনু সেই গেল হাট *
খেয়াল না কর কেন ওহে দিনদার ॥"[১]

বাড়ির ভিতরে নারী সম্পূর্ণভাবে অবরোধবাসী হয়ে অন্তরীণ থাকবে। যে অবরোধের বিরুদ্ধেই পরবর্তীকালে সোচ্চার হয়েছিলেন বেগম রোকেয়া ।

'তাম্বিয়াতন্নেছা' গ্রন্থেও গ্রন্থকার মালে মুহম্মদ কলিকালের নারী স্বাধীনতার নিন্দা করেছেন।

এদেশে আওরত দেখি বড়ই বদ চাল ।
তেকারনে থোরা এয়ছা লিখিনু মেছাল *
খছমের নাফরমানি করে জত নারী ॥
বে পর্দ্দায় বে এজ্জতে ফেরে বাড়ি *[২]

নারীর প্রতি এই যে বিধিবিধান আরোপ করা হয়েছ, গ্রন্থকারের মতে তা একটি সুফল বা নেকীর আশ্বাসে। তাঁদের বিশ্বাস নারীকে পর্দার মধ্যে রাখলে পুরুষ জাতি অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

রাখহে পরদার বিচে নারীকে আপন ॥
খুশিতে বেহেস্তে খাবে মেওয়া অগণন *
রাখহে বিবীকে পরদা বিচে হেফাজতে ॥
বাদশাই করিবে সদা খুশিতে জান্নাতে *[৩]

লেখক শুধু নারীদের প্রতি নিন্দা করেছেন, তা নয়, নারীর প্রতি পরুষের যে

---

১। মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *নছিহতে জানানা*, পৃঃ ১২।
২। মালে মুহম্মদ ঃ *তাম্বিয়াতন্নেছা*, পৃঃ ৮।
৩। ফছীহদ্দীন ঃ *মেছবাহুল ইসলাম*, পৃঃ ৭০।

Dhaka University Institutional Repository



কর্তব্য এ সম্পর্কেও লেখকের বক্তব্য নিম্নরূপ-

"তোমাদের মধ্যে ভাল ঈমানদার ওই ॥
আওরতের হক্কে তিনি করেন ভালাই *
.....
.....
মোবারক মুখে রাছুলুল্লা ফরমিয়াছে *
যে জন নরমি করে জরু লাড়কা পরে ॥
জেয়াদা ঈমানদার জানিও উহারে ॥[৪]

লেখক এখানে বলেছেন প্রকৃত ঈমানদার তিনিই, যিনি নারীর প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করে ও উত্তম ব্যবহার করে থাকেন।

নারীর জীবনেরও বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। নারী যে পুরুষের জীবনে অপরিহার্য, তাও আমরা দেখতে পাই। পুরুষের ভাগ্যে যত সুখ আছে তার মধ্যে নারীর সুখ প্রধান।

"শোনহে মোমিন কুল নারী দুকুলের মূল
কে পারে নারীর মূল্য দিতে ॥
বোঝ যোগ্য ভাগ্য লোকে ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্ম বর্গে
নারী লাগে সকল পক্ষেতে ॥[৫]

ফছীহদ্দীন তাঁর রচিত 'মেছবাহুল ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন, আমাদের সংসারে নারী ও পুরুষ দুইজনেরই সমান মর্যাদা। পৃথিবীর সকল উন্নত ও মহৎ সৃষ্টির মূলে নারী ও পুরুষ পাশাপাশি রয়েছে।

নর নারী দুজনায়, মানে গুণে একি প্রায়,
এ দোহায় সংসারের খুবি ॥

---

৪। ফছীহদ্দীন ঃ *মেছবাহুল ইসলাম*, পৃঃ ৯৭।
৫। ফছীহদ্দীন ঃ *মেছবাহুল ইসলাম*, পৃঃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository



এই দু-জন্যার দ্বারা, পয়দা হইল ছারা,
যত কিছু পীর ওলি নবী *
নারী কি সামান্য চিজ, বুঝে দেখ ও আজিজ,
তজবিজ করিয়া খুব দেলে ॥[৬]

কোন কোন দোভাষী পুঁথিতে নারীর পর্দা ও চলাচলের নিন্দা করা হয়েছে।

দিনে দিনে আওরতের হায়া উঠে গেল ॥
আখেরি জামানা ঠিক আসিয়া পৌছিল *
পাড়ায় পাড়ায় ফিরে দেওয়ানী করিয়া ॥
বেগনা মরদগণে ফেরে দেখাইয়া *[৭]

লেখক তৎকালীন সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে নারীকে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতেও নিষেধ করেছেন।

ক) আর কত আওরতে আওয়াজ ডাঙ্গর ॥
পর্দ্দা নশি বটে কিন্তু করে বড়া সোর *
বড় করি কথা বলা আওরতকে মানা ॥[৮]

খ) আওরতকে পর্দ্দা বিচে রাখহে সকালে ॥
দিন দুনিয়ার লাভ বুঝে দেখ দেলে *
আওরত লোকেরে খুব মতে বুঝাইয়া ॥
কোন মতে পর্দ্দা বিচে রাখ ছাপাইয়া *[৯]

স্ত্রী জাতির উপর বিভিন্ন রূপে বিধিনিষেধ আরোপ করা সত্ত্বেও তারা স্বাধীনভাবে যাতায়াত করত। নারীরা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যেত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

---

৬। ফছীহদ্দীন ঃ *মেছবাহুল ইসলাম*, পৃঃ ৯৬।
৭। মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *নছিহতে জানানা*, পৃঃ ১২।
৮। মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *নছিহতে জানানা*, পৃঃ ১৪।
৯। মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *নছিহতে জানানা*, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository



যদিও দোভাষী পুঁথিকারগণ তা সমর্থন করেন নি-

মরদকে বলে বিবি যাব আকিকাতে ॥
জায়ের নন্দের পিতা তাহার বাড়ীতে *
খরচ আনিয়া দেহ আকিকাতে যাই ॥
নাহি গেলে হবে বড় এটা বে দানাই *
.....
.....
বড়ই আনন্দ মনে সাজিলেন নারী *
পাঁচ সাত বিবি মিলে হৈলএক সঙ্গে *
সাজন করিল সবে নানা রঙ্গে ঢঙ্গে *[১০]

অনত্র–

কলিকালে এয়ছা নারী হাজারে হাজার *
জামাই বিয়াই বাড়ী করিলে গমন ॥
শাড়ী ও জেওর পিন্দে মনের মতন *
মুখে পান হাসি করে যে বচন ॥[১১]

এখানে লেখক পরোক্ষভাবে নারীর প্রাসধন প্রিয়তার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। সেকালে পর্দা-প্রথা যে শিথিল ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় ।

প্রয়োজনে নারীরা ঘর থেকে বের হত। দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্যও বেরুতো ।

আর কেহ বৈসে থাকে বাড়ীর মাঝেতে ॥
বিবীকে ভেজিয়া দেয় বাহির কামেতে *
গরু চরাইতে ভেজে আর কত কামে ॥
তেল আনিবার ভেজে তেলির মোকামে *[১২]

---

১০। মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।
১১। শাহ আবদুল করিম ঃ *মফিদুল ইসলাম*, পৃঃ ১২৩।
১২। মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *নছিহতে জানানা*, পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository


সেই সময়েও দরিদ্রের ঘরে পশুপালনের রীতি ছিল । এই পশুপালন বাড়ির মেয়েদের তত্ত্বাবধানে হত। নারী যে সংসারের জন্য শ্রম দেয় তা অপরিসীম ।

বিবি ভিন্ন কে যাইবে গরু চরাইতে *
গরু বকরি না হইলে চলিবেক নাই ॥
আমা হৈতে পর্দ্দা করা চলিবে কেয়ছাই *[১৩]

মধ্যযুগে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতু উপখ্যানে ফুল্লরাকে ছাগল চরাতেও দেখা যায়–

ধীরে ধীরে জায় রামা লইয়া ছাগল।[১৪]

প্রয়োজনে নারীরা ময়দানে লড়াইয়েও অংশগ্রহণ করত। যদিও তা সমর্থন করা হয়নি।

আওরতের কারবার মহল ভিতরে ॥
এখানে কি কাম তেরা ময়দান উপরে *
পরদার ভিতরে গিয়া রহ মহলেতে ॥[১৫]

নারীর স্বাধীনতা ধর্মে থাকা সত্ত্বেও লেখকগণ সনাতন পদ্ধতিতেই নারীকে মূল্যায়ন করেছেন।মহিলারা সাধারণ সভা সম্মাবেশে যোগদান করত। হযরত আনাস (রা:) এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা:) এক বিবাহ মজলিস থেকে নারী এবং শিশুদেরকে ফিরে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ "তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।"(*বুখারী ও মুসলিম*)[১৬]

নারী অনেক ক্ষেত্রেই প্রগতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নিজের বিয়ে, সামাজিক

---

১৩। মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ-২০।
১৪। সুকুমার সেন সম্পাদিত *মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল*, প্রথম প্রকাশ ১৩৮২, সাহিত্য আকাদেমী, পৃঃ ২৫৯।
১৫। সৈয়দ হামজা ঃ *জৈগুনের পুঁথি*, পৃঃ-১০।
১৬। আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ ঃ *রসূলের (সা:) যুগে নারী স্বাধীনতা, প্রথম খন্ড* [সম্পাদনা আবদুল মান্নান তালিব, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অরগানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিউট অব ইসলামিক থর্টস, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃঃ ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository



বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে কথা বলেছে। বিয়েতে পিতা কন্যার সম্মতির প্রয়োজন অনুভব করত। এর পিছনে শুধু পিতার সামাজিক দায়িত্বই প্রকাশ পেত না, ধর্মীয় বিধান অনুসরণও এর মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। কারণ, আমরা জানি, রাসূল(সা:) বলেছেন,

> বিনা অনুমতিতে বিধবা বিবাহ দেয়া যাবে না এবং সম্মতি ব্যাতিরেকে কুমারীকেও বিবাহ দেয়া যাবে না । (*বুখারী ও মুসলিম*) [১৭]

লেখক মুনশী মোহাম্মদ খাতের রচিত *'বোন বিবি জহুরানামা'* গ্রন্থে পিতা বিয়েতে কন্যার সম্মতি নিচ্ছে –

ক) বেরহিমে কহে মিয়া বৈস তবে তুমি ॥
বেটীকে এ কথা আগে পুছে আইসি আমি *
যদি সেই শুনে রাজি হয় এই বাতে ॥
সাদি তেরা দেলাইব তাহার সহিতে ॥ [১৮]

লালবানু সাহাজামাল গ্রন্থেও দেখা যায় --

খ) এখনি ঘরেতে আমি যাইয়া সেতাব ॥
বেটিতে পুছিয়া দিব এহার জওাব *[১৯]

শাহ গরীবুল্লাহ রচিত 'জঙ্গনামা' কাব্যে বিয়ের পূর্বে কনের কাছে সম্মতি চাইলে, সে তাতে অস্বীকৃতি জানায় –

নেকা পড়াইতে তবে তৈয়ার করিল ॥
এজিদ উকিল হইল সাইদ দুই জন ।
চলিল অন্দরে লিতে বিবির এজেন ॥

---

১৭। আবদুল হালীম আবু শুককাহ ঃ *রসূলের (সা:) যুগে নারী স্বাধীনতা*, সম্পাদনা আবদুল মান্নান তালিব , ১৯৯৫, পৃঃ ১৫৯।
১৮। মুনশী মোহাম্মদ খাতের ঃ বোন বিবী জোহুরানামা, পৃঃ ৪।
১৯। মুনশী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, পৃ-১৭।

Dhaka University Institutional Repository



ঘড়ি এক তিনজনে অন্দরে থাকিয়া ।
বাহানা করিয়া দেলে আইল ফিরিয়া ॥
কহিতে লাগিল আসি সবার হুজুরে ।
কবুল না কইল বিবি আবদুল জব্বারে ॥[২০]

উক্ত পংক্তিগুলোর মাধ্যমে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে নারীর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

ইসলামী বিধান মতে বিবাহের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যাকে দেবার পর কন্যার সম্মতি কবুল আবশ্যক।

বেগম কহেন তারে শুন বেটী কহি তোরে
বাপ তেরা দিতে চায় সাদী ॥
ভেজিল আমার তরে জিজ্ঞাসা করিতে তোরে
তুমি এতে রাজী হও যদি *[২১]

জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে নারীর ভূমিকা ছিল। 'মালুখাঁ ও রসনেছা' গ্রন্থে বিধবা নারী রসনেসা তার নিজের পছন্দের কথা দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করেছেন-

মালুখাঁর সাথে বাবা মোরেদেহ শাদী ॥
বড় নেককার তিনি জমানার হাদি *
তাহার জন্যেতে মেরা সদা জ্বলে জান ॥
তার সাথে দেহ শাদী শুন বাবাজান *[২২]

বিবাহের ক্ষেত্রে নারী যেমন তার পছন্দের কথা ব্যক্ত করেছেন তেমনি

---

২০। মুহম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদিত *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৪২।
২১। মুনশী আমিরুদ্দিন ঃ *গোল নূর রৌসন জামাল*, পৃঃ ৬৩।
২২। মুনশী মোকাম্মেল ঃ *মালুখাঁ ও রসনেছা কন্যার পুঁথি* পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository



অপছন্দের কথাও দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করেছেন ।

"সাহাজাদি গোলান্দাম এ কথা শুনিয়া॥
মাতাজিকে কহে বাত শুন দেল দিয়া *
কাহার কথায় আমি না করিব সাদি ॥
কি জন্যেতে কহ মাতা মোবারক বাদি *[২৩]

মোহরানা নির্ধারণে অথবা তার উসুলের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা বা বক্তব্য ছিল। কন্যার সম্মান রক্ষার খাতিরে যেন যথাযোগ্য 'জেওরাত' বা অলঙ্কারাদি দেওয়া হয় এমন দাবী লক্ষণীয়। মোহরানার ব্যাপারে ইসলাম ধর্মে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে-

আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মোহরানা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তাহারা মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।(সূরা নিসা)[২৪]

মোহরানা ও শর্ত নির্ধারণের ক্ষমতাও ছিল মেয়েদের। নির্ধারিত মোহরানা নিয়ে বিয়ে করছে এই দৃশ্য "লাল বানু সাহাজামাল" গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়-

"জরিনা বলে মেরা সাদির বাদেতে ॥
বাদসাই করিব আমি বসিয়া তক্তেতে *
আমরা মহরনা এই কহিবে বাদশায় ।
মঞ্জুর করিলে সাদি করি সাহাজাদায় *[২৫]

বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান। কিন্তু আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এই সামাজিক সমস্যা নারীর পারিবারিক জীবনকে অনেক সময় বিপর্যস্ত করে তোলে। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও সপত্নীবাদে কিভাবে সংসার বিনষ্ট হয় সে সম্পর্কে দোভাষী পুঁথিকারগণ অবহিত ছিলেন।

২৩। আয়জুদ্দীন ঃ *গোল আন্দাম*, পৃঃ ২০।
২৪। *আল কুরআনুল করিম* ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ২০০২, সূরা নিসা,আয়াত-৪, পৃঃ১১৬।
২৫। মুনশী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*,পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository


মুন্সী ছাদেক আলী সাহেব প্রণীত *'লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা'* গ্রন্থে সাত বছরের ছেলের সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়ের বাল্য বিবাহের চিত্র ফুটে উঠেছে–

সাত বচ্ছরের ছেন হৈল জামালের *
পাঁচ বচ্ছরের ছেন হৈল লালের ॥
জোড়া ভাল মিলিয়াছে কুরি ও দুলাতে *
খুশি হালে সাদি দেহ মোন আনন্দিতে ॥[২৬]

সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল । তা *'লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা'* গ্রন্থে লালবানুর পত্রলিখনের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে–

লেখে বিবি ধীরে সাহাজামালের তরে
শোন নাথ বলি যে তোমায় *
বিবাহ করিয়া মোরে রেখে মা বাপের ঘরে
চলে গেলে আপনা দেশেতে ॥
তিন সাল গেল যদি জরিনাকে কৈলে সাদি
সাহি তক্তে বসালে খুশিতে *[২৭]

সাহাজামাল লালবানুকে বিয়ে করে বাপের বাড়িতে রেখে আসে । তিন বছর পর সে জরিনা নামে আরেক নারীকে বিয়ে করে।

'তাম্বিয়াতন্নেছা'গ্রন্থে লেখক বহুবিবাহের সমর্থনে উক্তি করেন –

মমিন আওরতে চাহি এমন খেয়াল ॥
হুকুমে আল্লার যেছা করিবে আমল *
এয়ছাই হুকুম আছে মর্দ্দানা উপর ॥
চার নেকা করিবারে পারে বরাবর *[২৮]

---

২৬। মুন্সী ছাদেক আলী ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮।
২৭। মুন্সী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ৩২।
২৮। মালে মুহাম্মদ ঃ *তাম্বিয়াতন্নেছা*, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository


আমরা জানি পবিত্র কোরআনে সূরা নিসায় আছে-

তোমাদের যেরুপ অভিরুচি তদানুসারে দুই তিন ও চার নারীর পানি গ্রহণ করিতে পার, পরন্ত যদি আশঙ্কা কর যে, ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে। ঐ সূরায় আরও বলা হয়েছে, সকলের সহিত সমান ব্যবহার কর এবং কথোপকথনকালে সকলের সহিত সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত।[২৯]

কিন্তু এই শর্তাদি অনেকে পালন করে না। মেছবাহুল ইসলাম গ্রন্থে লেখক বলেন –

লালচে পড়িয়া তিন চার নেকা করে ॥
কিন্তু সকলের হক আদা নাই করে *[৩০]

দোভাষী পুঁথির যুগে সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কোন কোন পুঁথিকার বহুবিবাহ সমর্থন করলেও এই বহুবিবাহের যে কুফল তা তুলে ধরেছেন। সপত্নী কলহে সংসার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। বহুবিবাহকে পক্ষান্তরে সমর্থন করেছেন, কিন্তু সপত্নী কলহ সমর্থন করেন নি। শেখ কমরদ্দিন রচিত *'নেকবিবির কেচ্ছা'* গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় –

সতিন লিয়ে ঘর করা যদি এ সুন্নত ॥
তবে সে সতিনের পরে কর মালামত *
সতিনের সাথে কর কি জন্যেতে আড়ি ॥
কি বলে দু-বেলা কর চুল ছেড়াছেড়ি *
ভাল মুখে কথা নাই কও সতিনের ॥
ভারি মুখে থাক সদা কিসের খাতের *
যে সকল কান্ড কর সতিনের সাতে॥

২৯। *আল- কুরআনুল করীম* ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সূরা নিসা, আয়াত ৩,পৃঃ ১১৫।
৩০। ফছীহদ্দীন ঃ *মেছবাহুল ইসলাম*, পৃঃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository



শুনিয়া যে সব কথা জিভ কাটি দাঁতে *

কেহ সতিনের ঝালে পতি ছেড়ে দেয় ॥

গলে দড়ি দিয়া কেহ রসাতলে যায় *

.....

.....

কেহ সতিনের ঝালে গেল্লা খাওন্দের ॥

বেগানার কাছে সদা করেন জাহের*

কেহ সতিনের আগে পোড়ে সতিনেরে ॥

হলাহল জহর কেহ খেলাইয়া মারে *[৩১]

সপত্নী কলহ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। সে কারণে লেখক শেখ কমরুদ্দীন বিশেষভাবে বলেছেন সতীনের ঘর করা সুন্নত এবং তিনি সাবধানতার জন্য সপত্নীকলহে পতি ত্যাগ বা আত্মহত্যা করার নজিরও তুলে ধরেছেন।

নারী হৃদয়ের দু:খজনক ব্যাপার সপত্নীবাদ। কোন নারীই তার স্বামীকে অন্যের সাথে ভাগ করতে চায় না। বিভিন্ন দোভাষী পুঁথিতে এই সপত্নীবাদের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। *'বোন বিবি জহুরানামা'* গ্রন্থে-

ক) দেখে সতিনের তরে ফুল বিবী জ্বলে ॥

আগুনেতে তাপ যেন লাগে তার দেলে *[৩২]

আবদুল গনী রচিত *'শিরী ফরহাদ ও শাহাজাদা খসরু'* গ্রন্থে –

এতেক শুনিয়া মরিয়ম আফসোস করিয়া ॥

কহে সতীনের জ্বালা না সহে দুনিয়া *[৩৩]

*'শিরি ফরহাদ ও শাহজাদা খসরুর কেচ্ছা'* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে ,

---

৩১। শেখ কমরদ্দিন ঃ *নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ২৯,৩০।

৩২। মুনশী মোহাম্মদ খাতের ঃ *বোন বিবি জহুরানামা*, পৃঃ ৫ ।

৩৩। আবদুল গনী ঃ *শিরী ফরহাদ ও শাহজাদা খসরুর কেচ্ছা*, পৃঃ ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository


যদিও দ্বিতীয় বিবাহ প্রচলিত ছিল, তবুও প্রথমা স্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন ছিল-

'আমার আরজ বিবী তোমাকে জানাই ॥
একবার তোমার হুকুম যদি পাই *
তবে আমি একবার যাইয়া সেখানে ।
শিরীকে লইয়া আমি তোমার সামনে *
তোমার খাওয়াস মত রাখিব তাহায় ॥
রহিবে চাকর হেন তোমার জাগায় *'[৩৪]

লক্ষ্য করা যায়, প্রথম স্ত্রী এ - প্রস্তাবে সহজে সম্মতি দেন না ।

শুনিয়া মরিয়ম বিবী গোস্বায় জ্বলিয়া ।
শাহাজাদাকে কড়া বাত কহে গালি দিয়া *
গোশ্বায় জ্বলিয়া কহে খোসরূর তরেতে ॥
আমার বরবাদি তেরা আইল দেলেতে *
এছা বাত কহিলে কি সববে আমায় ॥
শিরীকে লইয়া আমি থাকিব এথায় *
বরদাস্ত না হবে মুঝে এই যন্ত্রনা ॥
আমার পরাণে ইহা কখন সবে না *[৩৫]

এখানে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দ্বিতীয় বিবাহে প্রথম স্ত্রীর অসম্মতি প্রকাশের ক্ষমতা ছিল। যদিও স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে বাধা দেওয়ার অধিকার ছিল তা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় নি। অর্থাৎ নিজের ভালোমন্দ বিচারের সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। স্বামীর পরদ্বার গ্রহণে বাধ' দেওয়ার মত সৎসাহস নারীর ছিল । **নারী যে শুধু হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হত তা নয় , অধিকার আদায়ের** সৎসাহস তার ছিল।

৩৪। আবদুল গনী ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯১।
৩৫। আবদুল গনী ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯১।

Dhaka University Institutional Repository


মুনশী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রচিত *'গোলে হরমুজ'* গ্রন্থে প্রেমের ক্ষেত্রে যে অংশীদার নেই তা দেখতে পাই। এই বোধ নারীর মধ্যে সব কালেই ছিল।

'তামাম বয়ান শুনে হরমুজ হইতে ॥
যে ধনি মান করিল আপন মনেতে *
বলে আর কাজ নাই ভাগের পিরীতে ॥
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ না রব জগতে *[৩৬]

এখানে, নারীর দৃঢ় মানসিক গঠনেরও পরিচয় পাওয়া যায় ।

আধুনিক যুগে নারী যেমন নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে, অতীতেও তেমনি তারা নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে। *'ভেলুয়া সুন্দরী'* গ্রন্থে নারী নির্যাতনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে পুরানে বর্ণিত রাম ও সীতার কাহিনীর প্রভাব বর্তমান। পথভ্রষ্টা বলে রামায়নের সীতার ন্যায় অগ্নি পরীক্ষায় ফেলা হয় ভেলুয়াকে। *'ভেলুয়া সুন্দরী'* গ্রন্থে আমরা দেখি –

তুলার উপর নিয়ারে তারা বসাইয়া দিল *
যখন আগুণ দিলরে তুলাতে জ্বালিয়া ॥
হুহু শব্দ করি অগ্নিরে উঠিল জ্বলিয়া *
আগুণের তেজরে দিল উঠিয়া আছমানে ॥
সব লোকে বলেরে কন্যা না বাঁচিবে জানে *
কেহ বলে সতী ভেলুয়া পুড়ি হবে ছাই ॥
কেহ উঠি বলেরে কন্যা এই দেশেতে নাই *[৩৭]

নারী নির্যাতন যে ছিল সেটা শাশুড়ি ননদের ব্যবহারের মধ্যেও পাওয়া যায়। এদের অত্যাচার তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল । বধূর উপর যে নির্যাতন করা

৩৬। মুনশী মোহাম্মদ ইউসুফ ঃ *গোলে হরমুজ*, পৃঃ ১২৬।
৩৭। মুনশী মোয়াজ্জেম আলী ঃ *ভেলুয়া সুন্দরী ও আমীর সওদাগরের কেচ্ছা*, পৃঃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository


হত তা *'ভেলুয়া সুন্দরী'* গ্রন্থে লেখক স্পষ্টভাবে বলেছেন –

ক) শাশুড়ী ননদী জানোরে যার ঘরে আছে ॥
কোন মতে সুখ নাইরে সেই বধুর কাছে *[৩৮]

খ) শাশুড়ী ননদী ঘরে অগ্নি বরাবররে ॥
জ্বালাইয়া মারিব মোরে কাষ্ঠের আকাররে *[৩৯]

তখনও দুই সন্তানের মধ্যে পুত্র সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল। মুনশী মোহাম্মদ খাতের প্রণীত *'বোন বিবি জহুরানামা'* গ্রন্থে –

ক) "কি করিব কেমনেতে করিব পালন *
বেটিকে রাখিয়া লিয়া বেটার কারন ॥
এখান হইতে যাই চলিয়া এখন *[৪০]

খ) বেটার দরদ মাগো হৈল তেরা দেলে ॥
না করিলে দয়ামায়া বেটি লাড়কি বলে *[৪১]

মোহাম্মদ মুনশী সাহেব প্রণীত *'রূপচাঁদ সওদাগর ও কাঞ্চনমালার'* কেচ্ছা গ্রন্থে দেখা যায় কাঞ্চনমালা ছয় ভাজের ষড়যন্ত্রের শিকার।

নিরালা মহলে রাখি তোমার খাতির *
শুনিয়া কাঞ্চনমালা স্বীকার করিল ॥
তাহাকে লইয়া ঢেকিশালেতে রাখিল *
সারাদিন বাদে কিছু মেলে খানাপানি ॥
দুঃখের নাহিক সীমা এত পেরেশানি *[৪২]

---

৩৮। মুনশী মোয়াজ্জেম আলী ঃ *ভেলুয়া সুন্দরী ও আমীর সওদাগরের কেচ্ছা*, পৃঃ ৮।
৩৯। মুনশী মোয়াজ্জেম আলী ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯।
৪০। মুনশী মোহাম্মদ খাতের ঃ *বোন বিবি জহুরানামা*, পৃঃ ৯।
৪১। মুনশী মোহাম্মদ খাতের ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯।
৪২। মোহাম্মদ মুনশী সাহেব ঃ *রূপচাঁদ সওদাগর ও কাঞ্চনমালার কেচ্ছা*, পৃঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository


নারী শুধু গৃহের মানুষের কাছে নির্যাতিত হয়েছে, তা নয়। সে স্বামী কর্তৃকও শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে।

খানা খাই দুইজনে খোসালিত মন ॥
হাত সাফ করাইয়ারে ভেলুয়া দিছে ততক্ষণ *
তার পরে ভেলুয়ায় তামাক সাজাইল ॥
আগুন আনিতেরে সাধু হুকুম করিল *
না পারিব বলিরে যখন ভেলোয়ায় ক'হিল ॥
হোক্কার নলের বারি সাধু খেঁচিয়া মারিল *
নলের বারি খাইয়ারে ভেলুয়া বেহুস হইয়া ॥
পালঙ্গের উপরে জানো রহিছে সুইয়া *[৪৩]

আমাদের সমাজে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। নারী স্বাধীনভাবে চলাচলের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই লাঞ্ছনার শিকার হয়। এই সামাজিক সমস্যা শুধু বর্তমানেই নয় অতীতেও ছিল। দোভাষী পুঁথির যুগেও নারী নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছে। মৌলবী রায়হান উদ্দীন রচিত *'গোলে আরজান'* গ্রন্থে বাদশা বাগানে শিকার করতে গিয়ে আরজান নামক সুন্দরী রমনীর সাক্ষাত পায় এবং তার মনে কুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। ফলে বাদশা তার চাকর দিয়ে আরজান বিবিকে অপহরণ করে।

এয়ছা ওক্তে পারেছের বাদশা নামদার ॥
বাগানে পৌছিল সেহ করিতে শেকার *
হঠাৎ আরজান পরে নজর গিরিল ॥
আশকের বরছা তার বুকেতে বিন্ধিল *
রূপেতে মজিয়া কহে নওকরের তরে ॥
হুকুম করিল ধর বিবির খাতেরে *

---

৪৩। মুন্সী মোয়াজ্জেম আলী ঃ *ভেলুয়া সুন্দরী ও আমীর সওদাগরের কেচ্ছা*, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository


এইরূপে হুকুম পাপি যখন করিল ॥
আরজান বিবিকে সবে যাইয়া ঘিরিল *[৪৪]

নারী সর্বদাই সংসারে ও সমাজে সম্মানিত স্থান অধিকার করেনি। নারীর প্রতি অসম্মান , তাচ্ছিল্য ও নির্যাতনের চিত্রে তা দেখা যায়।

ভোলা উঠি বলেরে সুন্দর কন্যা শুনরে খবর ॥
তামারে লুটিয়া নিবরে আমি কট্টালি নগর *
এই কথা শুনিরে কন্যা কান্দিতে লাগিল ।
চখের পানি পড়িয়ে ভেলুয়ার বুক ভিজি গেল * [৪৫]

মানব জীবনে প্রেম কোন কালেই নিষিদ্ধ ছিল না । মধ্যযুগের সাহিত্যেও প্রেম উপেক্ষিত হয় নি। ফারসি ও হিন্দি কাব্যের প্রভাব রয়েছে মুসলমান রচিত প্রণয়কাহিনীতে। সেখানে দেখা যায় নায়ক নায়িকাকে লাভ করার জন্য দেশান্তর যায় অথবা বিভিন্ন দু:সাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। অনেক সংগ্রাম করে সে নায়িকাকে লাভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নায়ক একাধিক নায়িকাকেও পত্নীরূপে বরণ করে। *গোলে বকাওলী*, *মৃগাবতী* ও *পদ্মাবতী* কাব্যে এই ধরনের কাহিনী আমরা প্রত্যক্ষ করি। দোভাষী পুঁথিতে প্রাক-বৈবাহিক বা দাম্পত্য প্রেমের উভয় প্রকার কাহিনী লক্ষ্য করা যায়।

মোহাম্মদ কোরবান আলী প্রণীত *'সখি সোনার কেচ্ছা'* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনচেতা প্রেমিক-প্রেমিকা স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে যায় –

মর্দ্দানা পোশাক আপন বদনে পড়িল *
লালমতি জওাহের যাহা কিছু পাইল ॥
গাঠুরি বান্ধিয়া আপন সঙ্গেতে লইল *

---

৪৪। মৌলবী রায়হান উদ্দীন ঃ *গোলে আরজান*, পৃঃ ৫৮,৫৯।
৪৫। মুন্সী মোয়াজ্জেম আলী ঃ *ভেলুয়া সুন্দরী*, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository


চুপে চাপে ঘর হৈতে যায় নেকালিয়া ॥
মানিকের নজদিগে পৌছিলেন গিয়া *[৪৬]

লায়লী কয়েসের প্রণয়কাহিনীতে প্রাক বৈবাহিক প্রেমের চিত্র রয়েছে –

মক্তবেতে দুই জন হয়ে খোশালিত মন
লেখাপড়া করিতে লাগিল ॥
গম আশকের ভার দিনে, দোহ্কার
থোড়া, বাড়িতে লাগিল *[৪৭]

যেহেতু তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল সেকারণে বাল্যপ্রেমের কাহিনী রচিত হতে দেখা যায়।

*'রাজকণ্যা মধুমালা'* গ্রন্থে নায়িকা ফুলের বাগানেতে প্রবাসী এক যুবককে দেখে তার আসক্তির কথা পত্র মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে। এই গ্রন্থে পুরুষের প্রতি নারীর আসক্তি প্রকাশ পেয়েছে। নারী ও পুরুষের প্রণয় পারস্পরিক । কোন কোন কাহিনীতে নারী আসক্ত হয়েছে। এই চেতনা নিয়ে কিছু কাহিনী নির্মিত হয়েছে।

গোপনে মহলে বিবী করে কি প্রকার *
আলিবর পাঠে বাপে লিখিল লিখন ॥
এবারত তার এই করিয়া মিলন *
ফলানা সাহার বেটা ফলানা নামেতে ।
আসিয়া পৌছিল মোর ফুল বাগানেতে *
গিয়াছিল আমি ও ভি ফুল উঠাইতে ॥
বাগানে হৈল দেখা তাহাতে সঙ্গেতে ।[৪৮]

---

৪৬। মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ সখি সোনার কোছা, পৃঃ ১৯।
৪৭। আবদুল জুদ জহিরুল হক ঃ লায়লী মজনু, পৃঃ ১১।
৪৮।জোবেদ আলী ঃ *রাজকন্যা মধুমালা*, পৃঃ ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository


আমরা মধ্যযুগের কয়েকটি কাব্যে লক্ষ্য করেছি নায়ক বা নায়িকার প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের পূর্বে স্বপ্ন দর্শন অথবা নায়ক বা নায়িকার চিত্রদর্শনে অনুরাগ বা প্রেমের জন্ম নেয়। যেমন- পদ্মাবতীতে শুক পাখির মুখে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা শুনে। *'মধুমালতী'*তে স্বপ্নদর্শনে নায়ক ও নায়িকা দুজনেই প্রণয়াসক্ত হন। এ ধরণের পুনরাবৃত্তি দোভাষী পুঁথিতে লক্ষ্য করা যায় । শাহ গরীবুল্লাহ রচিত *'ইউসুফ জোলেখা'* গ্রন্থে জোলেখা স্বপ্নে ইউসুফকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হয় –

জেলেখা ইউছফে দেখে খাওাব অন্দরে ॥
ছালাম করিয়া খাড়া হইল হুজুরে *
জেলেখা বলেন তিন সাল এক হালে ॥
হেরিয়ে স্বপনে তুঝে জিউ মেরা জলে *
কোথায় গোজরান তেরা নাহি জানি নাম ॥
কোন দেশে বসতি তেরা বাড়ী কোন গ্রাম *
আমাকে করিয়া বান্দি লিয়া যাও যাতে ॥[৪৯]

মোকাম্মেক প্রণীত *'মালুখাঁ রসনেছা'* গ্রন্থে নর নারীর প্রেমকে ও বিধবা রমনীর প্রণয়কে স্বীকার করেছেন। *'রসনেছা'* গ্রন্থে বিধবা নারী রসনেছা মালুখাঁ নামের একজন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। ফলে তার পিতা তাকে গৃহে বন্দী করে রাখেন ও নৃশংস ব্যবহার করেন । তা সত্ত্বেও রসনেছা সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তার প্রেমিকের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং পত্র প্রেরণ করে।

শুন, মালু সাহেব কহি তেরা ঠাঁই ॥
আমার এগানা কেহ দুনিয়াতে নাই *
শনিবারে তালতলার ঘাটে এসো তুমি ॥
রাত যোগে সেইখানে ঘাটে যাব আমি *

৪৯। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *ইউসুফ জোলেখা*, পৃঃ ১৯।

সেইখানে যাইয়া আমি উঠিব নৌকায় ।
তোমার সঙ্গেতে যাব যা করে খোদায় *
এতেক লিখিয়া পত্র মোহর করিয়া ॥
ঘাটের পথে কন্যা দাঁড়াইল গিয়া *[৫০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইসলামে বিধবা বিবাহ অসমর্থিত নয়। *'রসনেছা'* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ছিল । সে কারণে তারা প্রয়োজনবোধে পত্র লিখত।

দাম্পত্য প্রেম পারিবারিক জীবনকে মহিমান্বিত করে। দাম্পত্য জীবন মধুর হলে সেই পরিবারে সর্বদা সুখ ও শান্তি বিরাজ করে । মুনশী গরীবুল্লাহ রচিত *'নেকবিবির কেচ্ছা'* গ্রন্থে ফাতেমা ও আলীর সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবি রয়েছে–

আলি সাহা বাহিরেতে জান যদি দুরে ॥
ঠান্ডা হয় কলেজা আসেন জবে ঘরে *
ফাতেমা বিবির তরে করেন যে দোও ॥
আল্লাতালা করিবেন নেকি তেরা রওা *
এই মতে হামেহাল করেন গোজরান ॥
কভু নাহি দেলে আর থাকে পেরেসান *[৫১]

*'গাজীকালু ও চাম্পাবতী'* কন্যার পুঁথিতে দাম্পত্য প্রেম দেখা যায় –

তৎপরে চাম্পাবতী পান বানাইয়া ॥
পতির মুখেতে সতী দিলেন তুলিয়া *
গাজীও পানের খিলি তার মুখে দিল ॥
.....

৫০। মোকাম্মেল ঃ *মালুখাঁ ও রসনেছা কন্যার পুঁথি*, পৃঃ ২২,২৩।
৫১। মুনশী গরীবুল্লাহ্ঃ *নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository



কস্তুরী চন্দন চুয়া তামাকেতে দিয়া ॥
কনকের হুক্কা আনি দিল সাজাইয়া *
তামাক তাম্বল দোহে হরসিতে খায় ॥[৫২]

*'শিরী ফরহাদ ও শাহজাদা খসরূর কেচ্ছা'* গ্রন্থে দেখা যায় পাই দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতি যেমন থাকে তেমনি থাকে কলহ।

বাদশাই পাইলে শাদী আমাকে করিয়া *
তবুও আমার তরে কিছু চিন নাই॥
কিছু নাহি চাহ মেরা জানের ভালাই *
শিরীকে আনিতে চাহ মহলেতে আমার ॥
গোশ্বায় শরীর জ্বলে কথায় তোমার *[৫৩]

নারী চরিত্রের দুটি গুণের মধ্যে একটি হলো সেবাপরায়ণতা ও অন্যটি হলো সন্তান-বাৎসল্য। স্বামী ছাড়াও শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবা করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। মুনশী এবাদত আলী রচিত *'গোলে বকাওলী ও তাজল মুল্লুকের কেচ্ছা'* গ্রন্থে নারীর শ্বশুর সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করা যায় –

আজ্ঞা দিলে যেতে পারি কিছু দিনের তরে ॥
আমার হৈয়াছে সাধ সেবিতে শ্বশুড়ে *[৫৪]

সারা জীবন স্বামীর সেবা করে যায় এরকম রমণীর কথা রয়েছে *'তাম্বিয়াতন্নেছা'* গ্রন্থে –

আওরাতে ছুটি নাহি যাবত জেন্দেগী ॥
খছমের খেদমত করে আল্লার বন্দেগী *
ঘরের মেহনতে কাম করে যে আওরত ॥
হামেসা দেলেতে রাখে এমনি নিয়ত *[৫৫]

---

৫২। মুনশী আবদুর রহিম ঃ *গাজীকালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুঁথি*, পৃঃ ২৬।
৫৩। মুনশী আবদুল গনী ঃ *শিরি ফরহাদ ও শাহাজাদা খোসরূর কেচ্ছা*, পৃঃ ৯২।
৫৪। মুনশী এবাদত আলী ঃ *গোলে বকাওলী ও তাজলমুল্লুকের কেচ্ছা*, পৃঃ ৩০,৩১।
৫৫। মালে মুহাম্মদ ঃ *তাম্বিয়াতন্নেছা*, পৃঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository



ফছীহুদ্দীন রচিত *'মেছবাহুল ইসলাম'* গ্রন্থে বিবি রহিমার স্বামীভক্তির বিবরণ রয়েছে। বিবি রহিমা নিজে উপার্জন করে তার অসুস্থ স্বামীর সেবা করতেন ।

স্বামীকে খেলাইত খোশে যা কিছু বাঁচিতে শেষে
তাই খেয়ে আপনি রহিত ॥
এই মত দিন প্রতি রহিমা মাছুমা সতী
খাওন্দের খেদমত করিত *[৫৬]

মুনশী রহিমদ্দিন রচিত *'বেহুলা লখীন্দর ও চাঁদ সওদাগরের কেচ্ছা'* গ্রন্থে লেখক মুসলমান নারীদের পতিভক্তিতে অনুপ্রাণিত করার জন্য হিন্দু রমণীর উদাহরণ ও পুরানে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের উল্লেখ করেছেন-

মনেতে করিয়া ধ্যান যত রসি কান।
বিবেচন কর সবে আপন২ *
কেমন দরদী ছিল বেহুলা সুন্দরী ॥
জিলাইয়া আনে পতি কত কষ্ট করি *
কেমন স্বামীর ভক্ত ছিল হিন্দু নারী ॥
তাহার সুখ্যাতি আমি লিখিতে না পরি *"[৫৭]

হিন্দু রমণীর পতি ভক্তির এসব কাহিনী বিভিন্ন কাব্যে রয়েছে। লেখক এসব পুরান ও কাহিনীর সাথে পরিচিত ছিলেন বলে মুসলমান রমণীদের এসব কথা স্মরন করিয়ে তাদের পতিভক্তিতে উৎসাহিত করেছেন। মধ্যযুগেও আমরা লক্ষ্য করি নায়ক নায়িকার রূপের বর্ণনায় অথবা প্রেমের আদর্শ বিশ্লেষনে হিন্দু পুরানে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের উল্লেখ করেছেন। দোভাষী পুঁথি সাহিত্যেও এই ধারার অব্যাহত লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয় এই ধরণের তুলনামূলক উল্লেখে লেখকের পান্ডিত্য যেমন প্রকাশ পায়,

৫৬। ফছীহুদ্দীন ঃ *মেছবাহুল ইসলাম*, পৃঃ ৮৮।
৫৭। মুনশী রহিমদ্দিনঃ *বেহুলা লখীন্দর ও চাঁদ সওদাগরের কেচ্ছা*, পৃঃ ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository


অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্রও প্রকাশ পায়।

নারীদের স্বামী সেবার পিছনে ধর্মীয় অনুশাসন বা বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে–

বিবী বলে কেতাবেতে শুনেছি এ মত ॥
আল্লার বন্দেগী আর খছমের খেদমত *
সে করিবে সে পাইবে আখেরে নিস্তার ॥[৫৮]

নারী যে স্বামী সেবা করত তা স্বতঃস্ফূর্ত। তা সত্ত্বেও গ্রন্থকার ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেশ দিয়েছেন। *'তাম্বিয়াতন্নেছা'* গ্রন্থে লেখক স্বামী সেবা বা খেদমত ও আল্লার বন্দেগী সমান্তরাল দৃষ্টিতে দেখেছেন।

*'ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামাল'* গ্রন্থে স্বামী ছাড়াও শ্বশুর ও শাশুড়ির সেবা করতে দেখা যায়। পরীর কাহিনীতে মানবীয় গুণ আরোপ করা হয়েছে –

আমার এরাদা এই হইয়াছে মনেতে ॥
শ্বশুর শাশুড়ীর পায় খেদমত করিতে *[৫৯]

সন্তান-বাৎসল্য নারীর একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এই প্রবণতায় তারা একদিকে যেমন সন্তান কামনায় স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেন অন্যদিকে তেমনি সন্তানের জন্য স্নেহ-বাৎসল্যে উৎসাহিত হয়। *'ইউসুফ জোলে'খা'* গ্রন্থে বিবী রাহেলা সন্তান কামনায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন –

একদা দেলেতে জানি, ছাড়িয়া সে দানা পানি, রাহিলা করেন এবাদত ॥
রোজা ও নামাজ করে, হামেসা ওজিফা পড়ে,আরজ করেন ওঠাইয়া হাত *
কুদরত কামাল তুমি কি আর কহিব আমি, কুদরতে করিলে এ সংসার ॥
.....
.....
লইয়া তাহার নাম, সে ভজিলে পাইনাম, পুরা হয় তাহার বাসনা *[৬০]

---

৫৮। মালে মুহাম্মদ ঃ *তাম্বিয়াতন্নেছা*, পৃঃ ৪।
৫৯। মালে মোহাম্মদ ঃ *ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল*, পৃঃ ১৪৭।
৬০। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *ইউসুফ জোলেখা*, পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository


স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তোলার চিরন্তন বাসনা সেকালেও লক্ষণীয় ছিল।

সন্তানকে আদর করার চিত্রও দোভাষী পুঁথিতে পাওয়া যায় –

আমার মন্দিরে তুমি থাকিবে বসিয়া ॥
পরাণ জুরাক মোর তোমাকে দেখিয়' *
গাজীকে লইয়া কোলে অজুপা সুন্দরী ॥
খাওয়াইল অন্নজল অতি যত্ন করি *
দিনমান গত হৈয়া রাত্রি যবে হৈল ॥
বুকেতে লইয়া পুত্র অজুপা শুইল *[৬১]

## নারীর ধর্মচিন্তা বা ধর্মাচরণ

ধর্মের প্রতি মেয়েদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ লক্ষণীয় । সে কারণেই তারা ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠান পালনে সর্বদা তৎপর থাকেন। *'নেকবিবির কেচ্ছা'* গ্রন্থে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও কোরান পড়েন এমন ধার্মিক নারী দেখা যায় –

পাঁচ ওক্তের নামাজ পড়েন নেকজাত ॥
কোরাণ পড়েন বিবি বসে প্রহর রাত *
তার পরে হাত পাঙ দাবে খছমের ॥
নিদ্রা আসিলে তার সোয় বিবি ফের *
এইমতে হামেহাল করেন খেদমত ।[৬২]

পতিভক্ত নারীর অসুস্থ স্বামীকে সেবার সঙ্গে নামাজ পড়ে দোয়া করতেও দেখা যায় *'তাম্বিয়াতন্নেছা'* গ্রন্থে–

---

৬১। আবদুর রহিম ঃ *গাজিকালু ও চাম্পাবতি কন্যার পুঁথি*, পৃঃ ৮।
৬২। মুনশী গরীবুল্লাহ ঃ *নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

এক রাতে নামাজ পড়িয়া নেকবিবী ॥
মনাজাত করে মাঙ্গে আপনার খুবি *
বিমারে আছান দেহ খছমে আমার ॥
কান্দিয়া মাঙ্গেন দোওা দরগাতে আল্লার *[৬৩]

রাত দিন আল্লার বন্দেগী করে এমন নারীকেও দেখা যায় *'নেকবিবির কেচ্ছা'* গ্রন্থে–

আজরু নবির বেটি থাকে এই ঘরে *
এবাদত বন্দেগি করে রাত দিন ॥
বহুত বোজরগি দিল এলাহি আল মিন *[৬৪]

## নারী চরিত্রের বিভিন্ন প্রকৃতি

বেশ কিছু চরিত্রে দোভাষী পুঁথিকারগণ নারীকে বীরাঙ্গনা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। *'সখি সোনার কেচ্ছা'* গ্রন্থে বীরাঙ্গনা নারী চরিত্র দেখা যায়। নারী প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা ও অস্ত্র রাখত। নারী যে একেবারে অবলা নয় এই মনোবৃত্তি কারো কারো মধ্যে ছিল-

কথায়, কোশ ভর নেকলিল ॥
দাঙ পেয়ে সখিসোনা তলওয়ার খুলিল *
এক চোটে কমিনারে দুই ফাক করে ॥
এমন কাটিল যেন ক্ষিরা ফুটি চেরে *
মারা গেল ডাকাইত কমজাত বেঈমান ॥[৬৫]

নারী যে নিজগুণে যোদ্ধা হতে পারে, তার মধ্যেও সম্ভাবনা রয়েছে তা আমরা

৬৩। মালে মোহাম্মদ ঃ *তাম্বিয়াতুন্নেছা*, পৃঃ ১৯।
৬৪। মুনশী গরীবুল্লাহ ঃ *নেকবিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ১৪।
৬৫। মোহাম্মদ কোরআন আলী ঃ *সখি সোনার কেচ্ছা*, পৃঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository



শেখ আছিরুদ্দিনের '*জোলমাত নামা*' গ্রন্থে দেখতে পাই। নারী বিধর্মী বা মুসলমান হলেও সর্বদাই তুচ্ছ নয়। নারী পরম শক্তিশালী বা পরাক্রান্ত হতে পারে। তবে ইসলাম যেহেতু সত্যের ধর্ম তাই শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় দেখিয়েছে –

হুকুম করিল বিবি সইসের তরে ॥
জিনবন্দি করে ঘোড়া এনে দেহ মোরে *
সইস শুনিয়া ঘোড়া তৈয়ার করিয়া ।
হানুফা বিবির কাছে দিল পৌছাইয়া *
তখনি হানুফা বিবী কোমর বান্দিয়া ॥
লোহার টোপর দিল মাথায় তুলিয়া *
লোহার জিঞ্জির এক বান্ধিল কোমরে ॥
হাজার মনের গোর্জ্জ লিল হাত পরে *
তলওয়ার কাটারি ছুরি নেজা ও খঞ্জর ॥
ফাসির জিঞ্জির তীর বান্ধে পিট পর *
পিটেতে বান্ধিয়া ঢাল তৈয়ার হইয়া ॥
ঘোড়ায় চড়িয়া বিবি চলে নেকালিয়া *
.....
.....
হাক শুনে আলি শাহা উঠিল কাঁপিয়া ॥
আলির নিকট বিবী পৌছিলেন গিয়া *
.....
.....
গোস্বায় হানুফা কহে হযরত আলীকে *
এক চড়ে মদিনায় পাঠাব তোমাকে ॥
কত কত বাদসাগন এসে ওখানেতে *
লড়াই করিয়া হেরে গেল মেরা সাথে ॥[৬৬]

---

৬৬। শেখ আছিরুদ্দিন ঃ *জোলমাত নামা*, পৃঃ ৯,১০।

Dhaka University Institutional Repository



ঘোড়ায় চড়া, অশ্ব চালানো ও অস্ত্র ব্যবহারে নারী যে বীরাঙ্গনা পটু ছিল তা আমরা বুঝতে পারি।

মোহাম্মদ কোরবান আলী রচিত *'সখি সোনার কেচ্ছা'* গ্রন্থে বীরাঙ্গনা নারী মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় ।

মারিতে হুকুম কর বিচার না করে *
বাদশার হুকুম কড়া সখিসোনা শুনে ॥
গোস্বা হৈয়া কহে বিবি তৈমুছ কারণে *
শোনরে বেকুফ বাদশা তক্তে দিছ বার ॥
মারিতে হুকুম দিলে না করে বিচার *[৬৭]

অন্যায় আচরণের বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সৎ-সাহস নারীর ছিল। নারী অবলা জাতি এইধারণা সর্বক্ষেত্রে বদ্ধমূল ছিল না । এর ব্যতিক্রমও ছিল।

*'জৈগুনের পুঁথি'* কাব্যে জৈগুন এরেমের বাদশাজাদী । তাকে এক অসাধারণ বীরাঙ্গনা নারী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে -

হাজার সাবাস সেই আওরত উপর ।
মুল্লুকে পাহালওয়ান নাই যার বরাবর *[৬৮]

নারীকে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হিসাবে দেখানো হয়েছে মোহাম্মদ খাতেরের *'বোনবিবী জহুরানামা'* গ্রন্থে -

বোন বিবী হুঙ্কারিয়া চারদিকে বেড়া দিয়া
ঘেরে সবে এছমের জালে *
খুন্তি আশা ছিল হাতে ফুক দিয়া ছাড়ে তাতে

---

৬৭। মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ *সখি সোনার কেচ্ছা*, পৃঃ ৩৬।
৬৮। সৈয়দ হামজা ঃ *জৈগুনের পুঁথি*, পৃঃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository


ছেড়ে দিল আছমান পানে ॥
যেন বজ্রাঘাত গিরে ডাকিনী সবার ছেরে
বোন বিবির মহিমার গুনে *[৬৯]

## দূতী চরিত্র

বাঙলা সাহিত্যে দূতী চরিত্র বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই দূতী চরিত্রের ঐতিহ্য আমরা মধ্যযুগ থেকে দেখে আসছি। বড়ু চন্ডীদাসের *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'* কাব্যে বড়াই ও ভারতচন্দ্রের *'অন্নদামঙ্গল'* কাব্যে হীরামালিনী দূতী চরিত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূতী চরিত্র ঘটকের কাজ করে থাকে। নায়ক নায়িকার মধ্যে মধ্যস্থতা করেছে। দূতী চরিত্রে স্নেহ পরায়ণতা বা মানবিকতাও লক্ষ্য করা যায়।

রায়হান উদ্দীন রচিত *'গোলে আরজান'* পুঁথিতে দূতী কৌটুন বিবিকে দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার প্রচেষ্টা দেখা যায়–

কহে কৌটুন শুন বিবি, এবাত জানিবে খুবি, কহি আমি তোমার খাতেরে *
হইয়া বেগমজাদী, রহ তুমি নিরবধি, দেলেতে হছরত মেটাইয়া ॥
দেখিয়া তোমার রূপ, রূপেতে মজিল রূপ, তাই বুঝি আনি পাকড়িয়া *[৭০]

শাহ গরীবুল্লাহ রচিত *'ইউসুফ জোলেখা'* গ্রন্থে দাই ইউসুফকে তার হৃদয়ের মাঝে জোলেখাকে স্থান দেয়ার জন্য অনুরোধ করে।

দাই বলে শুন বাছা ইউসুফ কুমার ॥
তোমার লাগিয়া মরে জেলেখা আমার *
স্বপনে তোমারে দেখে মা বাপের দেশে ॥

---

৬৯। মোহাম্মদ খাতের ঃ *বোনবিবি জহুরানামা*, পৃঃ ১৪।
৭০। রায়হান উদ্দীন ঃ *গোলে আরজান*, পৃঃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository


ফিরিনু অনেক দিন তোমার তল্লাসে *
শুনেছ জেলেখার মুখে স্বপনের বয়ান ॥
জেলেখা তোমার তরে হারাইবে প্রাণ *
যেমন নাগর তুমি তেমন নাগরী ॥
.....
জেলেখারে রাখ তুমি হৃদয়ের মাঝে *
এখন যৌবন দেখি দিন দুই চারি ॥
রাখহ পরানে মোরে জেলেখা কুমারি *[৭১]

এই দূতী চরিত্র অনেক সময় লাঞ্ছনার ও শিকার হত –

চড়লাথি লাঠি সোটা মারে কত শত ॥
মাথা মুড়াইয়া চুন কালি দিল কত *
বড় আশা করে মোরে করিলে উচিল ॥
ভাদুরে তালের মত মারে কত কিল *[৭২]

মধ্যযুগের *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'* কাব্যে আমরা দেখেছি দূতী চরিত্র বড়াই, কৃষ্ণর পক্ষ হয়ে রাধার কাছে প্রস্তাব দেয়। রাধা তখন বড়াইকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। একই ধরণের পুনরাবৃত্তি *'সোনাভান'* কাব্যে প্রত্যক্ষ করি । আবার, এই দূতী চরিত্র জীবিকার তাগিদে অর্থের বিনিময়ে মানুষের সর্বনাশ করত।'জঙ্গনামা'কাব্যে মায়মুনা কুটনীপনার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সমাজে *'কুটনী বুড়ি'* নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ক) মাইমুনা নামেতে সেই বুড়ি কুটনী ॥
জগৎ ভুলায় বুড়ি সেইত মায়মুনী ॥[৭৩]

আবার,

খ) এক ভাইকে কোন মতে পার মারিবারে ।
দশ হাজার মোহর যে এখনি দিব তোরে ॥

৭১। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ ইউসুফ জোলেখা, পৃঃ ৩৭।
৭২। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *সোনাভান*, পৃঃ ১০।
৭৩। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

শুনিয়া মায়মুনা কহে কত বড় দায় ।
হাজার মোহর সেই ঘড়ি দিল তায় ॥
দেখিয়া মায়মুনা বুড়ি খোসালিত মনে ।
বলিল জহর দিব ইমাম হাসানে ।[৭৪]

মৌলবী রায়হান উদ্দীন প্রণীত *'গোলে আরজান'* গ্রন্থে বাঈ চরিত্র দেখা যায়। সেই সময়ে পেশাদার নর্তকী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করত।

কাশমিরের বাঈ কত আইল মজলিছেতে ॥
তানসিনে গায় গীত মধুর সুরেতে *
ছন্দে বন্দে বাঈগণ নাচে আর গায় ॥
হাত তালি দেয় আর বগল বাজায় *[৭৫]

সেকালে বাঈজীর নৃত্য বিনোদনের অঙ্গ ছিল।

*'গোলে বকাওলী ও তাজল মুল্লুকের কেচ্ছা'* গ্রন্থে নারীর ছলাকৈশলের পরিচয় পাওয়া যায়–

অতি সুগঠন আর রূপের কামিনী ॥
হরিতে পরের ধন দুরন্ত ডাকিনী *
প্রদীপ দেখিলে হয় পতঙ্গ যেমন ॥
তেমন কটাক্ষে লোকের চুরি করে মন *[৭৬]

নারী ছলনাময়ী, বিশ্বাসঘাতিনী ও কুহকিনী এই চেতনা থেকে চরিত্রটি এসেছে। মুনশী গরিবুল্লাহ রচিত *'দেলারাম'* গ্রন্থে মধ্যযুগের কাব্যের প্রভাব রয়েছে । এই গ্রন্থে

৭৪। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *জঙ্গনামা*, পৃঃ ১৬১।
৭৫। মৌলবী রায়হান উদ্দীন ঃ *গোলে আরজান*, পৃঃ ১১৯।
৭৬। মুনশী এবাদত আলী ঃ *গোলে বকাওলী*, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository


আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রয়োজনে মেয়েরা অবরোধের বাইরে যেত।

রাখিল বেটির নাম বলে দেলারাম *
যখনেতে পায় ফেরে সেই বিবি ॥
কতলোক লিল দেখে সুরতের খুবি *
দেখিতে বিবির রূপ কত সওদাগর ॥
লইয়া যায় দোকান উপর *
আশরফিতে সকলে মিঠাই কিনে খায় ॥
দেলারাম সকলেরে পানি যে পেলায় *
যে জন পিতেন সেই দেলারামের নাম ॥
জনে মোহর এক দিতেন এনাম *[৭৭]

এই গ্রন্থে পিতা পরোক্ষভাবে কন্যাকে মুদ্রা অর্জনের জন্য ব্যবহার করছে। কন্যার রূপের আকর্ষণে ক্রেতার সমাগম হয়।

শাহ গরীবুল্লা রচিত *'ইউসুফ জোলেখা'* গ্রন্থে দেখা যায় যদিও শিকার করা তখনকার দিনে রাজা বাদশাদের বিনোদন ছিল, নারীরাও তাতে অংশ নিত।

জেলেখা সেকার যায় জঙ্গল ভিতরে ॥
ঘেরাও করিয়া চলে তামাম লস্করে *
ঢাল ঝান্ডা আটাকাটি সেকারী কুকুর ॥
শিকারী বাহুরি বাজ ডাহুক ময়ুর *
তিরেন্দাজ রায় বাস ঢালি পাইক ধায় ॥
সিকার পিছেতে ঘোড়া ছেপাই উঠায় *
এইরূপে জঙ্গলে২ ফিরে২ ॥[৭৮]

---

৭৭। মুনশী গরীবুল্লাহ ঃ *দেলারাম*, পৃঃ ৪।
৭৮। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *ইউসুফ জেলেখা*, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

# নারী-শিক্ষা

শিক্ষা মানুষকে আলোকপ্রাপ্ত করে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎসাহিত করে । ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা দেয়। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, তখনকার দিনে নারী শিক্ষার আলোকে আলোকিত। নারীর মানসিক বিকাশ ঘটেছে। পক্ষান্তরে, পুরুষজাতির নারী শিক্ষার প্রতি অনীহা ছিল। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয় নি । তথাপি নারী শিক্ষা লাভ করেছে। নারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা স্বশিক্ষা লাভ করে নিজের জীবনের ভালোমন্দ বেছে নিয়েছে।

আবদুল জুদ জহিরুল হক রচিত *'লায়লী মজনু'* গ্রন্থে কন্যা শিক্ষা লাভ করতে মক্তবে যাচ্ছে, এই চিত্র দেখতে পাই –

সেই দিন তার সাতে, লাইলীকে পড়াইতে, মক্তবেতে দিল তার বাপ ।
ওস্তাদতো দোহাকারে, বহুতি পিয়ার করে, পড়াইতে লাগিল যতনে ॥
লায়লী ও কয়েসেতে , পড়ে দোহে এক সাতে, খোশালিত হইয়া যে মনে ।
মক্তবেতে দুই জন, হয়ে খোশালিত মন, লেখাপড়া করিতে লাগিল ॥[৭৯]

তৎকালীন সময়ে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ছিল। সে কারণে তারা প্রয়োজনবোধে পত্র লিখত। *'লালবানু সাহাজামাল'* গ্রন্থে লালবানু তার স্বামীর কাছে চিঠি লিখছে –

লালবানু আনন্দিতে, রোকা লিখে নিজ হাতে , মনমত জামাল সাহায় ।
পহেলা আল্লাহর নাম, লেখে বিবি নেকনাম,আপনার আহওাল তারপরে ॥
লেখে বিবী ধীরে, সাহাজামালের তরে, শোন নাথ বলি যে তোমায় ।
বিবাহ করিয়া মোরে, রেখে মা বাপের ঘরে, চলে গেলে আপন দেশেতে ॥[৮০]

তখনকার দিনে মক্তবের দ্বার অবারিত ছিল। *'সখি সোনার কেচ্ছা'*, *'লাইলী মজনু'*

৭৯। আবদুল জুদ জহিরুল হক ঃ *লাইলী মজনু*, পৃঃ ১১।
৮০। মুন্সী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository


প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, শিক্ষার আলো তখন নারীর মধ্যে ছিল। তাই, হৃদয়ের আকুতি জানানোর জন্য বা প্রতিবাদ করার জন্য হাতে কলম ধরেছিল। শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে তাদের চিন্তা চেতনায় এসেছিল আধুনিকতা ।

এইরূপে দুইজনা পড়ে মক্তবেতে ॥
মাতোয়ালা হইয়া রহে এস্কের নেশাতে ॥[৮১]

সমকালে যে নারী শিক্ষা ছিল তা অনুধাবন করা যায় রহিমন্নেছার পুঁথি নকল থেকে। রহিমন্নেছা দৌলত উজীর বাহরাম খানের *'লায়লী মজনু'* কাব্যের একটি পুঁথির লিপিকর। রহিমন্নেছা যে শুধু পুঁথি নকল করেছেন তা নয় তিনি কাব্যও রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের নাম *'ভ্রাতৃবিলাপ'*। এছাড়া তৎকালে রাজ মহিষীরাও শিক্ষিত ছিলেন। তাই রাজমহিষীদের মধ্যে অনেকে পুঁথি লিপিকর ছিলেন । এগুলো ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সেই সময়ে নারীরা শিক্ষার আলোকে আলোকিত ছিলেন। ত্রিপুরার বগাশইর থানা নিবাসী জমিলা গাজী ও জপেলা গাজী নামে দু'জন মহিলা নিজেদের ব্যবহারের জন্য কবি আবদুল হাকিমের *'লালমতী সয়ফল মূলক'* কাব্যটি নকল করেন। (*বাংলা একাডেমী উন্নয়ন বোর্ড পুঁথি-১৫৮*)[৮২]

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে আমরা লক্ষ্য করলাম, নারী পর্দার কঠোর বিধানে অবরুদ্ধ হলেও তারা উন্মুক্ত আলোকের প্রত্যাশী ছিল। শিক্ষার আলোও তাদেরকে উজ্জীবিত করেছে। তাই তারা জীবন সঙ্গী নির্বাচনে অথবা নিজের ইচ্ছা অভিলাসকে সম্পূর্ণ করতে উন্মুখ হয়েছে। এমনকি নারীকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেও দেখা যায়। তবে দোভাষী পুঁথি রচয়িতাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পর্যাপ্ত ছিল না, সংস্কার ও বিশ্বাসই প্রধান ছিল। তাই নারীদের শিক্ষা এবং আধুনিকতা সম্পর্কে সেকালের সনাতন সমাজের বিরোধিতা ছিলো সুতীব্র।

---

৮১। মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ *সখী সোনারা কেচ্ছা*, পৃঃ ১৩।

৮২। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা*, চতুর্থ সংস্করণ ২০০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ২৮,২৯।

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়

# দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে নারী সমাজ

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে নারীকে একটি প্রধান ভূমিকায় লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ কাব্যে তারা নায়িকা অথবা নায়িকার সহচরি। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানেও তাদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বলাবাহুল্য সেকালে যৌথ পরিবার প্রথা ছিল। সেক্ষেত্রে সংসারে বা পরিবারে নারীর অবস্থান কিছুটা সীমিত ছিল। কেননা,শ্বশুর–শাশুড়ী পরেবেষ্টিত সংসারে তাদের স্বাধীনতা ছিল খুবই কম।

বিবাহ, আকিকা, জন্মদিন ইত্যাদি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান আমাদের সমাজে পালিত হয়। এর মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানই প্রাধান্য পেয়ে থাকে । আমরা দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে এই বিবাহের বিশদ বিবরণ লক্ষ্য করি। এটি সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ উপকরণ বলে আমাদের বিশ্বাস । এ আচার–অনুষ্ঠানে নারী সমাজে প্রচলিত পোশাক-আশাক, প্রসাধন ও অলঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করা যায়। সাধারণভাবে সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবাহ যেমন প্রধান, তেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীরাও ছিল প্রধান।

*'শিরি ফরহাদ ও শাহজাদা খোসরূর কেচ্ছায়'* নায়িকার সখীরা বিয়ে উপলক্ষে বাড়ি সাজায় ও পেশাদার গায়িকারা মঙ্গল গীত পরিবেশন করে –

শুভক্ষণ দেখিয়া যতেক সখীগণ ।
করায় কন্যার সাজ খোশালিত মন *
মহল সাজায় আগে নানা রঙ্গ ঢঙ্গে ॥
গায়েন মঙ্গল গীত সখী সব রঙ্গে *[১]

নৃত্য বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনোদনের মাধ্যম ছিল। বিবাহ উপলক্ষে

---

১। আবদুল গনী ঃ *শিরি ফরহাদ ও শাহাজাদা খসরূর কেচ্ছা*, পৃঃ ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository


বাঈজীদের নৃত্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।

কাশ্মীরের বাই নাচে সামনে দুলার
নাচ গান দেখে লোক লাগে চমৎকার ।[২]

বিয়ের উৎসবে মহিলারা আনন্দে একে অপরকে আতর গোলাপের পিচকারি ছিটাতো–

কেহ নাচে কেহ গায় মোহিত হইয়া ॥
আতর গোলাপ ছিটে পিচকারী লইয়া *[৩]

বধূবরণ আমাদের দেশের একটি প্রচলিত অনুষ্ঠান । এই বধূবরণ অনুষ্ঠানে নববধূকে শ্বশুর বাড়ির মহিলাগণ আনন্দ উৎসবের সাথে বরণ করে নেয়। *'লালবানু শহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা'* কাব্যে আমরা দেখি –

লালকে লইয়া ঘরে পৌছিলেন গিয়া *
বউ বেটা দেখে বেগম কোলে তুলে নিল ॥
..... .....
দাইগণ দুইজনের পাঙ ধোয়াইল ॥
কেহ বা লইয়া পাঙ্খা ঝালিতে লাগিল *[৪]

বিয়ে উপলক্ষে বৌ–ভাত আমাদের সমাজের ঐতিহ্যবাহী একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। নতুন বধূর আগমন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে মূলত মহিলাদের ভূমিকাই প্রধান হয়ে থাকে -

সোনার খাটেতে বসায় অতি সমাদরে *
রং-বেরঙ্গ খানাপিনা আনে ভাতে ॥
সকলেতে খায় খানা বসে এক সাথে *

---

২। মুনশী গরীবুল্লাহ ঃ *দেলারাম*, পৃঃ ২৪।
৩। মোহাম্মদ ইউসুফ ঃ *গোলে হরমুজ*, পৃঃ ৩২।
৪। মুন্সী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু শাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository


কর্পুল তাম্বুল খায় খোশবুয় কস্তুরী ॥

রঙ্গে রঙ্গে সাজে নারী হাসি খুশী করি *[৫]

মুন্সী মোহাম্মদ এব্রাহিম রচিত *'নছিহতে জানানা'* গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন দোভাষী পুঁথির যুগে মহিলারা বিয়ে, আকিকা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেত। এসব অনুষ্ঠানে তারা নাচ ও গান পরিবেশন করত।

ক) দেখ কত বিবী কুটুম্বিতা খেতে যায় ॥

সাদী বিয়া আকিকাতে যেথায় সেথায় *[৬]

খ) পিন্দিয়া রঙ্গিন শাড়ী জেওর গহনা ॥

কুটুম্বের বাড়ী বলি হইল রওয়ানা *

.....

.....

কুটুম্বের ঘরে গিয়া যখন পৌছিল ॥

প্রথমেতে আলাপ কৌতুক আরম্ভিল *

.....

.....

তারপরে করিতে লাগিল নাচ গান ॥

বানারসী বাই যেন কেড়ে লয় প্রান *

কবির দলের মত দল সাজাইয়া ॥[৭]

সবকালের নারীদের মধ্যে প্রাসাধন ব্যবহার ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রসাধনের প্রতি নারীদের অনুরাগ চিরন্তন। রূপচর্চার বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই রূপ-সচেতনতা সেকালের রমণীদের মধ্যেও ছিল। প্রসাধন, অলঙ্কার ও পোশাক বর্ণনায় আমরা একটি বিশেষ সমাজচিত্র পাই। সেখানে দেখা যায় নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এবং সৌন্দর্য পিপাসু মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন, অলঙ্কার ও

৫। মুনশী মালে মোহাম্মদ ঃ *ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল*, পৃঃ ৭।
৬। মুন্সী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *নছিহতে জানানা*, পৃঃ ১৬।
৭। মুন্সী মোহাম্মদ এব্রাহিম ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository


পোশাক ব্যবহার করত।

তেল গিলা সোন্দা মেথি কস্তুরী আগর ॥
আনিল গোলাব পানি ডালিয়া আতর *
শরীর মলিয়া খুব উপটন মাখায় ॥
খোসবুই গোলাব জলে গোসল দেলায় *[৮]

বর্তমান যুগে নারীরা রূপচর্চার উপকরণ হিসেবে 'উপটন' ব্যবহার করে থাকে। 'উপটন' বিভিন্ন দেশজ উদ্ভিদজাত উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় । নারীরা এই 'উপটন' পূর্বে গৃহে তৈরী করত অঙ্গচর্চার উদ্দেশ্যে। বর্তমানে 'উপটন' বিভিন্ন বিপনীকেন্দ্রেও বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হয়। দোভাষী 'পুঁথির যুগে নারীরাও যে রূপসচেতন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'উপটন' ব্যবহারের উদাহরণ থেকে। শুধু নারীরা নয়, কোন কোন দোভাষী পুঁথিকারগণও নারীদের প্রাকৃতিক উপকরণ দ্বারা রূপচর্চায় অনুপ্রানিত করেছেন-

যুবতী নারীকে চাহি হামেসা উপটন ॥
দেখিলে খুশিতে রবে খছমের মন *
..... ..
..... ....
তেল গিলা সোন্দা মেথি হরিদ্রা চরাই ॥
হামেসা গোছল করে থাকিবে সাফাই *
.....
.....
চক্ষেতে কাজল সোরমা দাতে দিবে মিসি ॥
হাতে পায়ে দিবে মেন্দি দেখিবার খুসি *[৯]

সেকালে নারীরা আতর গোলাপ, চন্দন, ফুলের তেল প্রভৃতি মেখে দেহ সুগন্ধ

---

৮। আবদুল গনী ঃ *শিরি ফরহাদ ও শাহজাদা খসরূর কেচ্ছা*, পৃ ঃ ১৪৩।
৯। মালে মুহাম্মদ ঃ *তাম্বিয়াতন্নেছা*, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository


করত। সুগন্ধ দ্বারা কেশ ও বেশ বিন্যাস করত।

ক) আতর গোলাপ খুব মলে অঙ্গ পরে ॥
ফুলের তৈল খোসবু দিয়া দিল ছেরে *[১০]

খ) বসন টানিয়া, বাহাতে ধরিয়া রোয় মুখ গোলাপ মাখি *[১১]

বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার অঙ্গে তেল ও বাটা হলুদ দিয়ে গোছল করানো হত সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে -

তৈল হলদি মলে খুব দুলহীনের গায় ॥
সোহাগিনী নারীগণ গোছল দেলায় *[১২]

এছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠানে কনের হাত ও পা মেহেদী দিয়ে রাঙানোর ঐতিহ্য চিরাচরিত–

শিরীকে গোসল দিয়া, পালঙ্গে বসায় লিয়া *
চারিদিকে ঘিরে সখিগণ ॥
দিল মেন্দি হাতে পায়, আতর মলিল গায় *
বস্ত্র আনি পেন্দায় তখন *[১৩]

বর্তমান যুগে সাদা দাঁত সৌন্দর্যের অঙ্গ বলে বিবেচিত। কিন্তু সে যুগে দাঁতের মধ্যে কালো দাগ নারীর সৌন্দর্য-বর্ধন করত বলে মনে করা হতো । তাই তখনকার দিনে নারীরা দাঁতে মিশি ব্যবহার করত।

নয়নে কাজল দিয়া মিশি দিল দাঁতে
হাতে পায়ে মেন্দি দিল বিম্বফল প্রায় ॥[১৪]

---

১১। মুনশী এবাদত আলী ঃ *গেলে বকাওলী ও তাজল মুল্লুকের কেচ্ছা*, পৃঃ ৩৫।
১২। মুন্সী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল*, পৃ ঃ ১৮।
১৩। আবদুল গনী ঃ *শিরি ফরহাদ ও শাহাজাদা খসরুর কেচ্ছা*, পৃ ঃ ১৪১।
১৪। জোবেদ আলী ঃ *রাজকন্যা মধুমালা*, পৃঃ ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository


মহিলারা চোখে সৌন্দর্য-বর্ধনের জন্য কাজল ও সুরমা ব্যবহার করত –

দাঁতে মিশি আখে ছোরমা সাহাজাদি দিয়া ॥
জেওর পোশাক পেন্দে খুসিতে ভরিয়া *[১৫]

নারীরা প্রসাধন হিসেবে পায়ে আলতা পড়ত –

পায়েতে আলতার রঙ্গ, ডগমগ করে *
অঙ্গে কি দিইব রূপের তুলনা ॥[১৬]

নারী তার বিভিন্ন অঙ্গের শোভাবর্ধন করতে বিভিন্ন নামের অলঙ্কার ব্যবহার করে থাকত। নাকের আভরণের বর্ণনা –

নাকেতে সোনার নত, মতির ঝালরের কত ॥
রওশনী করে ঝলমল *[১৭]

কানে কানবালা, ইয়ারিং, ঝুমকা নামের বিভিন্ন অলঙ্কার পরত –

কানেতে সোনার ঝুমকা কানবালা সাতে ॥
তাহাতে হীরার ফুল বাহার দেখিতে *[১৮]

নারী বাহুতে পরত বাজুবন্দ, হাতে চুড়ি, কঙ্কণ ও অঙ্গুরীয় –

ক) বাজু মধ্যে দিল বাজুবন্দ *
যে দেখে তাহার লাগে ধন্দ ॥
হাতে পুছি কুড়ি সাহানা *
মধ্যে মধ্যে বন্দ তার বাতানা ॥ [১৯]

১৫। রায়হান উদ্দিন ঃ *গোলে আরজান*, পৃঃ ৮৮।
১৬। রায়হান উদ্দিন ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯০।
১৭। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *ইউসুফ জোলেখা*, পৃ ঃ ২২।
১৮। মুনশী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ১১।
১৯। মুন্সী গরীবুল্লাহ ঃ *দেলারাম*, পৃ ঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository



খ) হাতে তার বাজুবন্দ পটরী সোনার ॥

আঙ্গুলে আঙ্গুটি দিল হিরা ও পান্নার *[২০]

পায়ের শোভাবর্ধনের জন্য নূপুর বা পাসুলি পরত –

বাকখাড়ু মল পায়, পাওজেব ঘঙ্গুরু তায়,

অঙ্গুরী হীরার পরিধান *[২১]

সমসাময়িক কালে মহিলাগণ গলায় সিতিপাটী, গজমতি হার, হাঁসুলী, পাঁচনরী চিক নামে বিভিন্ন অলঙ্কার পরত –

পাচনরী চিক ফের দিল তার গলে ॥

গজমতি হার তায় যেন অগ্নিজ্বলে *[২২]

কটি-দেশের আভরণ হিসেবে ব্যবহার করত চন্দ্রহার –

কোমরেতে ছিল চন্দ্রহার ।

পায় কড়া দিল গোল তার ॥[২৩]

মহিলাদের পোশাকের যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে পাওয়া যায় বানারসী শাড়ী, জামদানী শাড়ী, রেসমের শাড়ী, সাহানা কারচবী শাড়ী, ঘাগরী, জরির চাদর, সিল্কের উড়না, জড়ির জুতা, রেশমী রুমাল প্রভৃতি ।

ক) সাহানা কারচবী সাড়ি পিন্দাইয়া দিল ॥

আঙ্গিয়া কুত্তি আতলোসের অঙ্গেতে পরিল *

দোপাট্য জরির এক দিল তার গায় ॥

..... .....

.....

---

২০। মুন্সী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ১১।
২১। আবদুল গনী ঃ *শিরি ফরহাদ ও শাহাজাদা খসরুর কেচ্ছা*,পৃঃ ১৪১।
২২। মুন্সী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, পৃঃ ১১।
২৩। মুন্সী গরীবুল্লাহ ঃ *দেলারাম*, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

মতি টাকা কারচুরি জুতা দিল পায় ॥
মিশি ও পানের লালি ঠোঁটেতে জমায় *[২৪]

খ) পায়েতে জরির জুতি, কতরঙ্গ তাতে মতি ,
হাঁটিতে যে চকমক করে *[২৫]

আমরা লক্ষ্য করেছি, নারীরা যাতে অপরিচিত পুরুষের সামনে না যায়, তাদের রূপ-সৌন্দর্য অপরকে আকৃষ্ট না করে সে জন্য কবিগণ পর্দা-পুষিদার কথা বরাবর উচ্চারণ করেছেন। তা সত্ত্বেও নারীদের প্রসাধন ও অলঙ্কার ব্যবহারে যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় এবং এসব ব্যবহার যে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি তা এসব বর্ণনায় পরোক্ষভাবে কবিগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কোন কোন কবি নারীদের রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য বোরখার আশ্রয়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন বোরখা খুলে ফেলার পরে তাদের রূপ-সৌন্দর্য কিভাবে ছরিয়ে পরে –

ক) জানানা লেবাছ বিবী করে আপনার *
সাহেব জামাল একে আছিল জৈগুন ॥
জেওর পোশাকে রূপ হইল চৌগুণ *
হুর পরী মোহ যায় ছুরত দেখিয়া ॥
ছুরত ছাপায় বিবী বোরখা ডালিয়া *[২৬]

খ) পরীর উজীর কহে শুন নামদার ॥
বোরখা খুলিয়া বাত কহ একবার *
আপনার মোবারক নাম কহ শুনি ॥
.....
.....
বোরখা খুলিল বিবি আপনার হাতে ॥
রওশন হইল ডেরা বিবীর ছুরতে *[২৭]

---

২৪। মুন্সী ছাদেক আলী ঃ *লালবানু সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, পৃ ঃ ১১।
২৫। আবদুল গনী ঃ *শিরি ফরহাদ ও শাহাজাদা খসরুর কেচ্ছা*, পৃ ঃ ১৪২।
২৬। সৈয়দ হামজা ঃ *জৈগুনের পুঁথি*, পৃ ঃ ৮৬।
২৭। সৈয়দ হামজা ঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository


সন্তান-সম্ভবা মাকে নিয়ে আমাদের দেশে অনেক আচার–অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান পালনের রীতি দোভাষী পুঁথিতেও লক্ষ্য করা যায় -

চারি মাসে রমনীরা মনেতে উল্লাস ॥
এইমতে গোজারিয়া গেল পঞ্চমাস *
ছয় মাসে ষষ্ঠী করিল সাতে সপ্তফল ॥
অষ্টমেতে অষ্ট কোনা বাঁধিল মন্ডল *
নয় মাসে করে ঠিক সেতার গণন ॥[২৮]

দোভাষী পুঁথির যুগে মহিলারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল । স্বামীকে বশীকরণের জন্য বিবাহিত নারীরা যাদু-টোনার আশ্রয় নিত। যাদু-টোনা, তাবিজ-কবজ প্রভৃতি প্রয়োগে স্বামী বশীভূত হয় এরূপ বিশ্বাস নারীদের মধ্যে ছিল। শাহ গরীবুল্লাহ রচিত *'জঙ্গনামা'* কাব্যে হাসানের স্ত্রী কদবানু স্বামী হাসানকে বশীভূত করার জন্য যাদু-টোনার আশ্রয় নেয় মায়মুনার নিকট থেকে।

না কান্দ না কান্দ বিবি শুন মেরা বাত ।
ভাল এক দারু জানি আছে মেরা সাথ ॥
বড়ই আজমুদা দারু কহি তেরা ঠাঁই
ঝুট বাত কহি যদি খোদার দোহাই ॥ [২৯]

আমরা জানি, কবিগণ বিশেষ সমাজেরই মানুষ। তাই তাঁরা চারপাশের সমাজ সম্পর্কে যেমন অবহিত থাকেন, তেমনি পারিপার্শ্বিক সমাজের চিত্র তাঁদের কাব্যেও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে, এসব তথ্য সমাজতত্ত্ববিদদের গবেষণার উপাত্ত হয়ে থাকে।

---

২৮। মোহাম্মদ সেকান্দর আলী বেপারী ঃ *গহর বাদশা ও বানেছা পরীর পুঁথি*, পৃ ঃ ৭।
২৯। মুহাম্মদ আব্দুল জলিল সম্পাদিত *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা*, পৃ ঃ ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কাল অষ্ঠার শতক থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। এসময় মুসলমান সমাজ শিক্ষায় সম্যক অগ্রসর ছিল না। ফলে, তাদের মধ্যে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার এবং অনুদারচিত্ততা পুঞ্জিভূত হতে থাকে। পাশাপাশি নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অভাবে তারা ছিল অবহেলিত, পুরুষ সমাজ দ্বারা শাসিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত।

কলকাতার বটতলা ও চকবাজারের কেতাবপট্টির বদৌলতে যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত –

(১) কাহিনী-ধারা,

(২) ধর্ম বিষয়ক ও নীতিকথা ।

এ দুটি ধারাতে নারী এসেছে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আবার কোথাও পরোক্ষভাবে। কাহিনীগুলোতে নারী বা নারীর চিন্তা এসেছে পরোক্ষভাবে। আর প্রত্যক্ষভাবে শাস্ত্রকথা বা নীতিকথায় সেকালের নারীমুক্তি, অবরোধ বা স্বাধীনতা সম্পর্কে তৎকালীন সামাজিক বিধিনিষেধ বা রীতিনীতির কথা পাওয়া যায়। দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে বেশ কিছু নীতি-গ্রন্থমূলক বা ধর্মীয় বিধিবিধানমূলক গ্রন্থে রচিত হয়েছে, যাতে ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীর অবস্থান বিচার করা হয়েছে। উনিশ শতকের বেশ কিছু গ্রন্থে সমকালীন বা তথাকথিত কলিকালের নারী স্বাধীনতার নিন্দা করা হয়েছে।

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে কাহিনী কাব্যগুলো নায়িকা-নির্ভর অর্থাৎ নায়িকাকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনী-কাব্যে কোথাও নারী সক্রিয়, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কোন কোন কাহিনীতে নায়িকাকে পাওয়ার জন্যই নায়কের অভিযান। সেখানে নায়িকা প্রায় প্রচ্ছন্ন। কিন্তু নায়িকা প্রত্যক্ষ বা

Dhaka University Institutional Repository


প্রচ্ছন্ন যাই হোক না কেন সেখানে একটি সমাজ এবং সেই সমাজে নারীর একটি বিশিষ্ট অবস্থান প্রত্যক্ষ করা যায়।

বাংলা দোভাষী পুঁথি সাহিত্য স্বল্পশিক্ষিত এবং নিম্নবিত্ত মুসলমানদের পাঠের জন্য লেখা হয়েছিল । আমরা দোভাষী গুঁথিতে সমাজের দৃষ্টিতে নারীর যে চিত্র দেখি তাতে লক্ষ্য করা যায় –

(১) নারীরা পুরুষের সমকক্ষ নয় ।

(২) পুরুষের তুলনায় নারীরা ধর্মবিরুদ্ধ কাজে অধিকতর লিপ্ত।

(৩) নারীরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয় এবং পুরুষকে প্রলোভিত করে।

এপ্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, দোভাষী পুঁথিকারগণ নারী, নারী-শিক্ষা এবং নারী-স্বাধীনতার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখলেও তাঁরা সমকালীন নারী-জাতির কথা চিন্তা করেছেন, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা বিচার করেছেন, এটা কম উপেক্ষেণীয় বিষয় নয়।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে দোভাষী পুঁথির পাশাপাশি হিন্দু সমাজ স্বজাতির নারী সমাজকে কিভাবে কুসংস্কারের বেড়জাল থেকে উদ্ধার করেছে তাও দেখানো হয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি,দোভাষী পুঁথিকারদের মধ্যে যথাযথ শিক্ষার অভাব ছিল। যার ফলে, তারা একদিকে যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্যদিকে তাদের মধ্যে মুক্তবুদ্ধির অভাব ছিল। তাই লক্ষ্য করা যায়, নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে দোভাষী পুঁথি-রচয়িতাগণ ও সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি। তবে এর পাশাপাশি মুসলমান কবি

Dhaka University Institutional Repository


সাহিত্যিকগণ যাঁদের মধ্যে শিক্ষা-জ্ঞান প্রসারিত ছিলো এবং যাঁরা সাধু ভাষায় গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা নারী জাগরণের কথা বলেছিলেন । স্ত্রী-শিক্ষার বিকাশে তাঁদের ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোজাম্মেল হক, লুৎফর রহমান প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনই একমাত্র রমণী, যিনি নারী জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন। তাঁদের সকলের রচনায় নারী সমাজ আলোর মুখ দেখেছে।

তাছাড়া, দোভাষী পুঁথিকারগণ সমকালীন নারী সমাজের কথা ভেবেছেন, তাদের অভাব অসুবিধার কথাও বলেছেন। তবে পর্দা, অবরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মের অনুশাসনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, সামাজিক মূল্যবোধ তাদের বিচার্য ছিল না।

*Dhaka University Institutional Repository*

# সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

## ক) দোভাষী পুঁথি

১। আয়জদ্দীন, মুন্‌শী ঃ *গোল আন্দাম*, পাকিস্তান বুক ডিপো, ইসলামপুর রোড, ঢাকা, ১৩৬৬।

২। আব্দুল গনী, মুন্‌শী ঃ *শিরী ফরহাদ ও শাহজাদা খসরুর কেচ্ছা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮।

৩। আছমত উল্লাহ, মুন্‌শী ঃ *ফাতেমা জোহরানামা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১।

৪। আমিরদ্দিন, মুনশী ঃ *গোলে নুর রৌসন জামাল*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা।

৫। আব্দুর রহিম, মুনশী ঃ *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুঁথি*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা।

৬। আমিরুদ্দিন ঃ *মনছুর হাল্লাজ*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা, ১৯৬১।

৭। আবদুল গাফ্‌ফার ঃ *নুরবক্ত-নওবাহার*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চক বাজার, ঢাকা।

৮। আব্দুর রহিম, মুন্‌শী ঃ *শেখ ফরিদের পুঁথি*, কলিকাতা ১৩৫৬।

৯। আব্দুর রহিম ঃ *আদম অজুদ তত্ত্ব*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৬১।

১০। আব্দুর রহিম, মুন্‌শী ঃ *দেল দেওয়ানা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৬১।

১১। আশরাফ উদ্দীন, মুন্‌শী ঃ *হাসেম-কাজির পুঁথি*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৬১।

১২। আশরাফ উদ্দীন, মুন্‌শী ঃ *হেদায়েতুল ইসলাম*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৬১।

১৩। আশরাফ উদ্দীন, মুন্‌শী ঃ *কেয়ামতনামা ও বেহেস্তনামা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৫০।

Dhaka University Institutional Repository


১৪। আবদুল ওহাব ও মুঃ রিয়াজউদ্দীন ঃ *ছায়েত নামা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা।

১৫। আশরাফ উদ্দীন, মুন্‌শী ঃ *ফকির বিলাস*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা।

১৬। আয়জদ্দীন আহ্‌মদ ঃ *বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ*, লোয়ার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১৭। আবদুল লতিফ, মুন্‌শী ঃ *সেক-ভানুর পুঁথি*. হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১।

১৮। আশরাফ উদ্দীন ঃ *শাহদৌলার পুঁথি*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০।

১৯। আলীমুদ্দীন ঃ *মোহরে ছোলেমানী*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮।

২০। মোঃ আজিজ ঃ *দরবেশনামা*।

২১। আশরাফউদ্দীন ঃ *মউত নামা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।

২২। আবদুল করিম, মুন্‌শী ঃ *নক্‌সে ছোলেমানী-২য় ভাগ*, ৮/১ বাবু বাজার,ঢাকা।

২৩। আবদুল গনি ঃ *আছরারচ্ছালাত ও বারচান্দের ফজিলত*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫২।

২৪। আয়জদ্দিন আহ্‌মদ ঃ *ছেকান্দার নামা*, চিৎপুর রোড, কলিকাতা, ১৩৩১।

২৫। এছহাক আলী, মুন্‌শী ঃ *শহিদে কারবালা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা, ১৩৬৮।

২৬। এবাদত আলী ঃ *গোলে বকাওলী*, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

২৭। ওয়াজেদ আলী, মুন্‌শী ঃ *সত্যপীরের পুঁথি*, ৮/১ বাবু বাজার, ঢাকা।

২৮। কাজী আমিনুল হক ঃ *জঙ্গে কারবালা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চক বাজার, ঢাকা, ১৯৬১।

২৯। কাজী হেয়াত মোহাম্মদ ঃ *জারি জঙ্গনামা*, ৮/১ বাবু বাজার, ঢাকা।

৩০। কমরুদ্দীন খন্দকার ঃ *ছমির জামাল বা সৎমায়ের লীলা*, ৮/১ বাবু বাজার, ঢাকা।

৩১। খোয়াজ ডাক্তার ঃ *বেবাহার পুঁথি*, ১২৬২।

৩২। খাতের ঃ *আম্বিয়া*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চক বাজার, ঢাকা।

৩৩। গরীবুল্লাহ, মুনশী ঃ *দেলারাম*, পাকিস্তান বুক ডিপো, ৪০ ইসলামপুর রোড, ঢাকা, ১৩৬৮।

৩৪। গরীবুল্লাহ, মুনশী ঃ *নেকবিবির কেচ্ছা*, কলকাতা, ১৩১৫।

৩৫। গোলাম ফরিদ, মুন্‌শী ঃ *সোলেমানী তালেনামা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা।

৩৬। গরীবুল্লাহ, মুনশী ঃ *রৌসনল মোমেনিন*, হরিহর প্রেস, কলকাতা ১৮৬৭।

৩৭। গরীবুল্লাহ, মুনশী ঃ *দেলরৌসন*, হরিহর প্রেস, কলকাতা ১৮৬৮।

৩৮। ছাদেক আলী, মুন্‌শী ঃ *লালবানু-সাহাজামাল ও জরিনা বিবির কেচ্ছা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার,ঢাকা।

৩৯। ছাদ আলী, মুন্‌শী ও আবদুল ওহাব, মুন্‌শী ঃ *শহিদে করবালা*, ৮/১ বাবু বাজার, ঢাকা।

৪০। ছমিরুদ্দিন আহমদ, মুন্‌শী ঃ *কাছেদনামা বা জয়নাল উদ্ধার পর্ব*, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো, ৬নং বাবু বাজার, ঢাকা, ১৩৬৮।

৪১। ছৈয়দ শাহ ছাদত আলী ঃ *এলাজে লোকসাধন বা লজ্জতে দুনিয়া*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা।

৪২। জবেদ আলী ঃ *রাজকন্যা মধুমালা।*

৪৩। জহিরদ্দিন ও হায়দার জান ঃ *আগর ও গোল।*

৪৪। জোনাব আলী, মুন্‌শী ঃ *নক্‌সে ছোলেমানী-১ম ভাগ*, ৮/১ বাবু বাজার, ঢাকা, ১৩৭০।

৪৫। জনাব আলী ঃ *রাহে নাজাত।*

৪৬। জয়নাল আবেদীন ঃ আবুসামা, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার , ঢাকা।

৪৭। জহিরুদ্দীন আহ্‌মদ, মৌলভী ঃ মক্‌ছদোল মোহ্‌ছেনিন, মোছলেম লাইব্রেরী, বাবু বাজার, ঢাকা।

৪৮। ফছিহ উদ্দিন, মুন্‌শী ঃ *মেছবাহুল ইসলাম*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা , ১৯৬৩।

Dhaka University Institutional Repository


৪৯। ফয়জর রহমান চৌধুরী ঃ *গোলশানে বাহার*।

৫০। মোহাম্মদ ইউসুফ ঃ *গোলে হরমুজ*, বাবুবাজার ,ঢাকা, ১৯৬০।

৫১। মোহাম্মদ সেকান্দার আলী বেপারী ঃ *গহর বাদশা ও বানেছা পরীর পুঁথি*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৬২।

৫২। মালে মোহাম্মদ ঃ *ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল*, চকবাজার,ঢাকা, ১৯৬২।

৫৩। মোঃ আকবর আলী, মুন্‌শী ঃ *আতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০।

৫৪। মোকাম্মেল, মুন্‌শী ঃ *মালুখাঁ ও রসনেছা কন্যার পুঁথি*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১।

৫৫। মোহাম্মদ কোরবান আলী ঃ *রে-মানিক ও সখি সোনার কেচ্ছা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা।

৫৬। মোহাম্মদ দানেশ, মুন্‌শী ঃ *গোল বা ছানুয়ার*, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

৫৭। মোয়াজ্জম আলী, মুন্‌শী ঃ *ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সওদাগরের কেচ্ছা*, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

৫৮। মোহম্মদ খাতের ঃ *বোন বিবী জহুরানামা*, ফসিহউদ্দিন আহমদ, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো,ঢাকা।

৫৯। মোহাম্মদ এব্রাহীম ঃ *নছিহতে জানানা*, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো,ঢাকা।

৬০। মোহাম্মদ মুন্‌শী ঃ *রূপচাঁদ সওদাগর ও কাঞ্চনমালার কেচ্ছা*, ৮/১ বাবুবাজার, ঢাকা, ১৩৬৫।

৬১। মো: বক্তার খাঁ,মুনশী ঃ *সূর্য উজাল বিবির পুঁথি*, হামিদিয়া লাইব্রেরী , ঢাকা, ১৯৬১।

৬২। মো: আকবর আলী ঃ *গোল –বা- সানুয়ার*, হামিদিয়া লাইব্রেরী,ঢাকা, ১৯৫৭।

৬৩। মোহাম্মদ দেরাসতুল্লা ঃ হুরনুর *বিবির কেচ্ছা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী , ঢাকা, ১৯৬১।

Dhaka University Institutional Repository


৬৪। মোজাম্মেল হক ঃ *অলেফ লায়লার কেচ্ছা*।

৬৫। মোহাম্মদ মুন্‌শী ঃ *বিধবা বিলাপ বা বিধবা বিচ্ছেদ*।

৬৬। মোহাম্মদ মুন্‌শী ঃ *শাশুড়ী-বৌয়ের ঝগড়া*।

৬৭। মালে মোহাম্মদ ঃ *তাম্বিয়াতন্নেছা*, চকবাজার, ঢাকা, ১৩৩৫।

৬৮। মালে মোহাম্মদ ঃ *নছিহতেন্নেছা*, চকবাজার, ঢাকা।

৬৯। মোহাম্মদ সুবেদার, মুনশী ঃ *জঙ্গে নওশাদ*, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো, ৬নং বাবুবাজার, ঢাকা-১, ১৩৬৮।

৭০। মোহাম্মদ চৌধুরী ঃ *হযরত আলীর খয়বরের জঙ্গনামা*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৬২।

৭১। মুনাওয়ার আলী ঃ *আলমাছ ও গোল রায়হান*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৬২।

৭২। মুনশী মনিরুদ্দিন ঃ *মনির মাহারু সুন্দরী*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৫৭।

৭৩। মোহাম্মদ খাতের ঃ *নিজাম পাগলার কেচ্ছা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা।

৭৪। মোহাম্মদ খাতের ঃ *একশত তিরিশ ফরজ*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা।

৭৫। মোহাম্মদ খাতের ঃ *জমজমা বাদশার কেচ্ছা*, সিদ্দিকিয়া বুব ডিপো, ঢাকা।

৭৬। মফিজ উদ্দিন আহ্‌মদ, মুন্‌শী ঃ *বেনামাজির নছিহত*, সিদ্দিকিয়া বুব ডিপো, ঢাকা।

৭৭। মোহাম্মদ এব্রাহীম ঃ *হেদায়েতল ফোচ্ছাক-হক নছিহত*, বাবুবাজার, ঢাকা।

৭৮। মো: আবদুল হোসেন ঃ *ফয়ছলে আহ্‌কাম*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

৭৯। মোহম্মদ খাতের ঃ *নূরনামা হুলিয়ানামা*, ঢাকা।

৮০। মালে মোহাম্মদ, ফকির ঃ *আখেরী জামানার হাল*।

৮১। মোহাম্মদ রেয়াজ ঃ *সাদ্দাতের নকল বেহেস্ত*।

Dhaka University Institutional Repository



৮২। মোহাম্মদ খাতের ঃ *তুতিনামা*।

৮৩। মোহাম্মদ দানেশ ঃ *চাহার দরবেশ*।

৮৪। মোহাম্মদ খাতের ঃ *শাহানামা*।

৮৫। মোহাম্মদ বক্তার খাঁ ঃ *এমাম চুরি*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০।

৮৬। মনিরুদ্দিন, মুন্‌শী ঃ *সোলতান সুফিয়ান শাহে-এমরান চন্দ্রবান*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।

৮৭। মোহাম্মদ মেহের উল্লা ঃ *মেহরুল এসলাম*।

৮৮। মোহাম্মদ আব্দুল গফুর ঃ *সোনারম'লা মতিরহার ( প্রথম খন্ড)*, হাজি আফাজদ্দিন আহম্মদ, ১৩৩১।

৮৯। মনিরুদ্দিন ডাক্তার ঃ *চামানে নওবাহার*, ১৮৮০।

৯০। মোহাম্মদ ফয়েজদ্দিন ঃ *নাজাতোল মোছলেমিন*, ১৮৭৯।

৯১। রায়হান উদ্দিন ঃ *গোলে আরজান*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা।

৯২। রমজান উল্লা,মুন্‌শী ঃ *ভানুবতী বিবির লড়াই*, সিদ্দিকিয়া বুব ডিপো, ঢাকা।

৯৩। রহিমুদ্দিন আহ্‌মদ,মুনশী ঃ *বেহুলা লখীন্দরও চাঁদ সওদাগরের কেচ্ছা*, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

৯৪। রহমতুল্লা ঃ *কাছাছোল আম্বিয়া*, হাজী পাড়া, শিয়ালদাহ, কলিকাতা, ১৩১৪।

৯৫। রিয়াজুদ্দিন ঃ *চোর পন্ডিত*, হামিদিয়া লাইব্রেরী ,ঢাকা, ১৯৬১।

৯৬। রবিউল্লা, মুন্‌শী ঃ *চৌদ্দ উজীর*, হামিদিয়া লাইব্রেরী ,ঢাকা, ১৯৬২।

৯৭। শেখ কমিরদ্দিন ঃ *নেকবিবির কেচ্ছা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা-১।

৯৮। শেখ আছিরুদ্দিন ঃ *জোলমাতনামা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা-১।

৯৯। শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা ঃ *আমির হামজা*।

Dhaka University Institutional Repository


১০০। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *সোনাভান*।

১০১। শাহ আবদুল করিম ঃ মফিদুল ইসলাম, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৫৬।

১০২। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *জঙ্গনামা*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার,ঢাকা-১।

১০৩। শেখ ওমরদ্দিন ঃ *খয়রল হাসর*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার,ঢাকা-১, ১৩৬৯।

১০৪। শাহ গরীবুল্লাহ ঃ *সত্যপীরের পুঁথি*, বাবুবাজার , ঢাকা।

১০৫। সৈয়দ হামজা ঃ *হাতেম তাই*, হামিদিয়া লাইব্রেরী,চকবাজার,ঢাকা, ১৯৬১।

১০৬। সৈয়দ হামজা ঃ *জৈগুনের পুঁথি*, হামিদিয়া লাইব্রেরী,চকবাজার,ঢাকা, ১৯৬১।

১০৭। সৈয়দ আকবর আলী ঃ *জেবলমুলুক শামারোখ*, বাবুবাজার,ঢাকা, ১৩৭০।

১০৮। সেখ রমজান উল্লা ঃ *কলির নছিহত*, দরজীপাড়া, মছজেদ বাটী ষ্ট্রীট।

১০৯। সাহা নূর ঃ *সাত কন্যার বাখান ও গৃহ জামাতার বিবরণ*, বন্দর বাজার, ১৩৪৭।

১১০। সৈয়দ সুলতান ঃ *ওফাতে-রসূল*, কুমিল্লা, ১৩৫৬।

১১১। সৈয়দ জান ঃ *নছিহতনামা*, সুলভ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৬৮।

১১২। হাবিবল হোসেন, মুনশী ঃ *জঙ্গে ছোহরাব*, ওসমানিয়া কুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা।

১১৩। হাবিবর রহমান ঃ *মোনাই-যাত্রা*, সিদ্দিকিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

## খ) অভিধান, গ্রন্থ তালিকা, গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান।

২। সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান।

৩। আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুঁথি পরিচিতি।

৪। বাংলা একাডেমীর 'শহীদুল্লাহ স্মৃতি পাঠকক্ষে'র পুঁথি তালিকা ।

Dhaka University Institutional Repository


## গ) আলোচনা গ্রন্থ ঃ

১। আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত *লুৎফর রহমান রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

২। আনিসুজ্জামান ঃ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ, ২০০১, আজিজ সুপার মার্কেট শাহাবাগ,ঢাকা।

৩। আহমদ শরীফ ঃ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (দ্বিতীয় খন্ড), প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪। আবদুল কাসিম মুহাম্মদ আহমুদ্দিন ঃ *পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯, পাকিস্তান পাবলিকেশনস্।

৫। আবদুল হালীম আবু শুককাহ ঃ *রসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা*, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সট্স, লালমাটিয়া, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।

৬। *আল-কুরআনুল করীম*, প্রকাশক মোহাম্মদ আবদুর রব, পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২।

৭। আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত *লুৎফর রহমান রচনাবলী*, দ্বিতীয় খন্ড, প্রীতি উপহার, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭।

৮। আবদুল কাদির সম্পাদিত *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯। আবদুল কাদির সম্পাদিত *শিরাজী রচনাবলী*, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৭, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-২।

১০। ডঃ এম.এ. রহিম ঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৬৭)*, দ্বিতীয় খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত,প্রকাশনায় আল-কামাল

Dhaka University Institutional Repository


আবদুল ওহাব, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৯, বাংলা একাডেমী , ঢাকা।

১১। ওয়াকিল আহমদ ঃ *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী , ঢাকা।

১২। কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত *মশাররফ রচনা সম্ভার* (দ্বিতীয় খন্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০।

১৩। কাজী ইমদাদুল হক ঃ *আবদুল্লাহ*, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০২, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৪। খোন্দকার সিরাজুল হক ঃ *ডাক্তার লুৎফর রহমান*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬।

১৫। গোলাম সাকলায়েন ঃ *মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক* , প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৭, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৬। নির্মলচন্দ্র চৌধুরী ঃ *বঙ্গ রমণীর বিস্মৃতি ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৫, প্রকাশক মণি সান্যাল গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা–৬।

১৭। পৃথ্বীলা নাজনীন ঃ *আত্মজীবনীমূলক রচনা*, মীর মশাররফ হোসেন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, বাংলা একাডেমী , ঢাকা।

১৮। প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত *বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৭, কলিকাতা-১২।

১৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামমোহন-গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-৬।

২০। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ,১৩৭১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২১। মুহাম্মদ এনামুল হক ঃ *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৭।

২২। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ *চকবাজারের কেতার পট্টি*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ( ঢাকা সিটি মিউজিয়াম)।

Dhaka University Institutional Repository


২৩। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার ,ঢাকা,১৯৬৪।

২৪। মুহাম্মদ আবদুল জলিল ঃ *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা*, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৫। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা ঃ সমকালের দর্পণে*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ,১৯৯১।

২৬। মুহাম্মদ শামসুল আলম ঃ *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ,১৯৮৯, বাংলা একাডেমী , ঢাকা- ১০০০।

২৭। মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন ঃ *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, প্রথম খন্ড*, ১৯৬০।

২৮। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঃ *পান্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা*, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৩, বাংলা একাডেমী , ঢাকা।

২৯। মালেকা বেগম ঃ *বাংলা নারী আন্দোলন*, মহিউদ্দীন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ।

৩০। মুস্তফা নূরুল ইসলাম ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৯।

৩১। অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সংকলিত মুদ্রিত *বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি (১৮৫৩-৬৭)* লেনিন সরণী, কলকাতা , প্রকাশ ২০মে ১৯৯৩।

৩২। রাজিয়া সুলতানা ঃ সাহিত্য বীক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮।

৩৩। সুকুমার সেন ঃ *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৩৫৮।

৩৪। সুকুমার সেন সম্পাদিত *মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল*, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮২, সাহিত্য আকাদেমী।

৩৫। Quzi Abdul Mannan : *The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal* up to 1855. Bangla Academy, Dacca, 1974.